গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়
Gauhati University
দূর এবং মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
Institute of Distance and Open Learning Learning

বাংলা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম
M. A. in Bengali

চতুর্থ ষাণ্মাসিক

দ্বিতীয় পত্র (Paper : 2)
প্রাদেশিক-সাহিত্য

বিষয়সূচী (Contents)

পত্র পরিচিতি (Paper Introduction)

বিভাগ - ১ : **আমার জীবনস্মৃতি : লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া**

বিভাগ - ২ : **কুড়ি শতিকার অসমিয়া কবিতা** (সম্পাদক : নীলমণি ফুকন) নির্বাচিত কবিতা — *মোর জীবনর সখা কৃষ্ণ : জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, কেরাণী শেলীর চিঠি* : মহেন্দ্র বরা, বিপ্লবী : অমূল্য বরুয়া, *সাগর দেখিছা :* দেবকান্ত বরুয়া, *মমতার চিঠি* : হেম বরুয়া

বিভাগ - ৩ : **ভারতজোড়া গল্পকথা** (সম্পাদক : রামকুমার মুখোপাধ্যায়) নির্বাচিত গল্প— *মাছ ও মানুষ, টোবা টেক সিং, বিজয় উৎসব, ইলিশ মাছের স্বাদ*

বিভাগ - ৪ : **ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'র ছোটোগল্প সংকলন** ('রেণু রচনা সঞ্চয়ন' অনুবাদ : ননী সূর। (নির্বাচিত গল্প : *ইতিহাস-ধর্ম আর মানুষ, তৃতীয় শপথ, এক আদিম রাত্রির সুবাস, ভিত্তিচিত্রের ময়ূরী)*

Contributor :

Anjan Paul (Unit : 1)	Dept. of Bengali Lumding College
Dr. Sanjay Bhattacharjee (Unit : 2)	Dept. of Bengali Gauhati University
Dr. Jahnabi Das Bhattcharjee (Unit : 3)	Dept. of Bengali Lumding College
Indrani Bhattcharjee (Units : 4 & 5)	Dept. of Bengali Jagiroad College

Course Co-ordination :

Prof. Kandarpa Das	Director, GUIDOL
Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University
Dipankar Saikia	Editor Study Material GUIDOL

Content Editing :

Dr. Amalendu Chakrabarty	HOD, Dept. of Bengali Gauhati University

Language Editing :

Sanjoy Chandra Das	Assistant Professor, Department of Bengali Pandu College, Guwahati

Proof Reading :

Sanjoy Chandra Das	Assistant Professor, Department of Bengali Pandu College, Guwahati

Format Editing :

Dipankar Saikia	Editor Study Material GUIDOL

Cover Page Design

Bhaskar Jyoti Goswami	GUIDOL

ISBN : 978-93-84018-76-4

May, 2015

© Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University. Further information about the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University courses may be obtained from the University's office at BKB Auditorium (1st floor), Gauhati University, Guwahati-14. Published on behalf of the Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University by Prof. Kandarpa Das, Director and printed at Maliyata Offset Press, Mirza, Copies printed 500.

Acknowledgement

The Institute of Distance and Open Learning, Gauhati University duly acknowledges the financial assistance from the Distance Education Council, IGNOU, New Delhi for preparation of this material.

পত্র পরিচিত

চতুর্থ ষাণ্মাসিক দ্বিতীয় পত্রের আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাই। এই পত্রে স্থান পেয়েছে প্রাদেশিক সাহিত্যের আলোচনা। এই বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ বাস করে। এই বিভিন্ন ভাষা-ভাষী মানুষের সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়ে আছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে। আমরা এই পত্রের আলোচনা প্রথমে অসমের অসমিয়া সাহিত্যের অন্তর্গত সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'আমার জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের আলোচনা করেছি। তারপর রামকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারতজোড়া গল্পকথা' গল্প সংকলনের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী নির্বাচিত গল্পের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সবশেষে হিন্দী কথাসাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর নির্বাচিত ছোটোগল্পের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বক্ষ্যমাণ পত্রের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করেছি। আসুন, আমাদের পাঠ্য বিষয়ের বিভাগ-গত বিন্যাসটি একবার দেখে নেওয়া যাক্—

বিভাগ - ১ : **আমার জীবনস্মৃতি** : **লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া**

বিভাগ - ২ : **কুড়ি শতিকার অসমিয়া কবিতা** (সম্পাদক : নীলমণি ফুকন) নির্বাচিত কবিতা — *মোর জীবনর সখা কৃষ্ণ : জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, কেরাণী শেলীর চিঠি* : মহেন্দ্র বরা, বিপ্লবী : অমূল্য বরুয়া, *সাগর দেখিছা :* দেবকান্ত বরুয়া, *মমতার চিঠি* : হেম বরুয়া

বিভাগ - ৩ : **ভারতজোড়া গল্পকথা** (সম্পাদক : রামকুমার মুখোপাধ্যায়) নির্বাচিত গল্প— *মাছ ও মানুষ, টোবা টেক সিং, বিজয় উৎসব, ইলিশ মাছের স্বাদ*

বিভাগ - ৪ : **ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'র ছোটোগল্প সংকলন** ('রেণু রচনা সঞ্চয়ন' অনুবাদ : ননী সূর। (নির্বাচিত গল্প : *ইতিহাস-ধর্ম আর মানুষ, তৃতীয় শপথ, এক আদিম রাত্রির সুবাস, ভিত্তিচিত্রের ময়ূরী)*

যদিও এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে, তবু সাধারণভাবে এগুলিকে কিছু বিষয়ের সংকলনগ্রন্থ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাই, আমরা আশা করব আপনাদের জ্ঞানানুসন্ধান এই উপকরণসমূহের বাইরেও বিস্তৃত হবে এবং আপনাদের নিজস্ব এক সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। প্রত্যেক বিভাগেই এই উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে একটি প্রসঙ্গ এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, — মূল গ্রন্থ পাঠের কোনো বিকল্প নেই। তাছাড়া, মূল গ্রন্থগুলির পাঠ, অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর আলোচনাসমূহ অনুধাবনে আপনাদের পক্ষে সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।

সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই পাঠ্য-উপকরণসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে বলে অনিচ্ছাকৃত ভুল তথা মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই সচেতন শিক্ষার্থী এই বিষয়ে চিঠির মাধ্যমে বা সরাসরি অবগত করালে আমরা কৃতার্থ হব এবং পরবর্তী সংস্করণ শুদ্ধ করে নেওয়ার চেষ্টা করব। বিশেষ কারণে এই পত্রে 'কুড়ি শতকের অসমিয়া কবিতা' (সম্পাদক : নীলমণি ফুকন) কবিতা সংকলনের আলোচনা এই পত্রে স্থান পায়নি। পরবর্তী সংস্করণে তা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আশা করি, আমাদের এই আয়োজন ও প্রচেষ্টা আপনাদের কাছে উপযোগী ও উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

বিভাগ পরিচিত

চতুর্থ যাণ্মাসিকের দ্বিতীয় পত্রের আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাই। এই পত্রে স্থান পেয়েছে — "প্রাদেশিক সাহিত্য"। এই পত্রে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'আমার জীবনস্মৃতি', রামকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারতজোড়া গল্পকথা'-এর নির্বাচিত গল্পের আলোচনা এবং ফণীশ্বরনাথ রেণুর নির্বাচিত ছোটোগল্পের আলোচনা স্থান পেয়েছে। আসুন, বক্ষ্যমাণ পত্রের বিভাগগত বিন্যাসটি দেখে নেওয়া যাক্—

বিভাগ - ১ : **আমার জীবনস্মৃতি : লেখকের জীবনী ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা—১**

বিভাগ - ২ : **আমার জীবনস্মৃতি : প্রাসঙ্গিক আলোচনা—২**

বিভাগ - ৩ : **ভারতজোড়া গল্পকথা : প্রসঙ্গ-কথা ও নির্বাচিত গল্পের আলোচনা**

বিভাগ - ৪ : **ফণীশ্বরনাথ রেণুর ছোটোগল্প সংকলন : লেখক পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা**

বিভাগ - ৫ : **ফণীশ্বরনাথ রেণুর ছোটোগল্প সংকলন : নির্বাচিত গল্পের আলোচনা**

বিভাগ-১

আমার জীবনস্মৃতি

আমার জীবনস্মৃতি : লেখকের জীবনী ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা —১

বিষয় বিন্যাস

১.০ ভূমিকা (Introduction)
১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)
১.২ জীবনী ও আত্মজীবনী
১.৩ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জীবন-আলেখ্য
১.৪ শিক্ষা-জীবন
১.৫ শৈশব-স্মৃতি
১.৬ প্রবাসে লক্ষ্মীনাথ
১.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ
১.৮ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)
১.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)
১.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

১.০ ভূমিকা (Introduction)

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে অসমের বুকে এক আলোক-সন্ধানী শিশুর জন্ম হয়েছিল; সেই শিশু পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জন করে অসমে জাতীয় নেতার আসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন, তিনি হলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁকে 'রসরাজ' এবং 'সাহিত্যরথী' লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াও বলা হয়। ১৮৬৮ সালের নভেম্বর মাসে লক্ষ্মীনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম দীননাথ বেজবরুয়া ও মাতা থানেশ্বরী দেবী। লক্ষ্মীনাথ ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শিবসাগর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। এর দুবছর পর এফ.এ. এবং ১৮৯০ সালে কলকাতার জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। ১৮৯১ সালে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বেজবরুয়ার সাহিত্যিক যোগ্যতা অনস্বীকার্য। ১৮৯০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত — এই চার দশক ধরে অসমিয়া সাহিত্যকে প্রগতির পথে চালনা করেছে লক্ষ্মীনাথের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য প্রচেষ্টা। নিজের সৃষ্টির দ্বারা তিনি অসমিয়া সাহিত্যে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিলেন। অসমিয়া সাহিত্যের বৈষ্ণব-যুগকে যদি শঙ্করদেবের যুগ বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে অসমের আধুনিক সাহিত্যের যুগ নিঃসন্দেহে বেজবরুয়া-যুগ। বেজবরুয়া ছিলেন 'জোনাকী', 'ঊষা', 'বিজুলী'

আদি পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং 'বাঁহী'-র সম্পাদক। ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আজ অসমের গর্ব ও অভিমানের মূলে রয়েছেন এই স্বদেশপ্রেমী, যাঁর সাহিত্যজীবনের অধিকতর সময় কেটেছিল প্রবাসে। অথচ তাঁরই রচিত 'ও মোর আপোনার দেশ' আজও অসম-সংগীত রূপে স্বীকৃত ও বহুমানিত।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জামাতা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার আত্মজীবনী 'মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ' প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর নিজেরই সাহিত্যপত্র 'বাঁহী'তে। গ্রন্থাকারে এর প্রকাশকাল ১৯৪৪। এর বাংলা অনুবাদ 'আমার জীবনস্মৃতি' এবং অনুবাদক হচ্ছেন আরতি ঠাকুর।

১.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

সাহিত্য হচ্ছে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মেলবন্ধন। তাই সাহিত্য নির্দিষ্ট কোনো একটি ভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে, তা বিভিন্ন ভাষাকে একইসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করে অনুবাদের মাধ্যমে। যার ফলে এক ভাষার সাহিত্য ও সাহিত্যিক অন্য ভাষাভাষীর মানুষের কাছে সমাদৃত হতে পারেন।

অসমিয়া সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। শ্রীশঙ্করদেব দ্বারা প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন আদর্শের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী হলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। অসমিয়া সাহিত্যের এমন প্রতিভাধর ব্যক্তির জীবন পড়াশোনা ও বৈবাহিক সূত্রে রঙ্গভূমির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বাংলার আচার-আচরণ-সংস্কৃতির সংস্পর্শে তিনি কীভাবে এসেছিলেন এবং সেগুলোর প্রভাব তাঁর জীবনে কতটুকু পড়েছিল, তা আমরা লক্ষ্মীনাথের জীবনী পাঠে জানতে পারি। তিনি নিজেই তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ'-এ সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্ম বৃত্তান্ত, তাঁর পারিবারিক জীবন, নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাঁর জীবনে বহু অসমিয়া প্রতিভাধর ব্যক্তির প্রভাব, জোড়সাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে আমরা আরতি ঠাকুর অনুবাদিত 'আমার জীবন স্মৃতি' গ্রন্থ পাঠে জানতে পারি। অসমিয়া সাহিত্য ও সেই ভাষার সাহিত্যিকদের বিষয়ে জানার আগ্রহ প্রদান এই গ্রন্থ পাঠের মূল উদ্দেশ্য।

১.২ জীবনী ও আত্মজীবনী

'জীবনী' ও 'আত্মজীবনী'- এর পার্থক্য নির্দেশ করার পূর্বে উভয়ের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই শব্দ দুটিতেই অর্থের অস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। জীবনী অর্থাৎ জীবন-কথা। এই জীবন-কথা সেই বিশেষ ব্যক্তির স্ব-লিখিত জীবন-কাহিনি নয়। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির জীবনী লিখতে গেলে অপর কোনো ব্যক্তিকে সক্রিয় হতে হয়। তাছাড়া কোনো মানুষের জীবন নিয়ে অপর কেউ জীবনী লিখতে তখনই উদ্যোগী হন, যখন ব্যক্তি

বিশেষের চরিত্রের বিশিষ্টতা, তাঁর প্রতিভা, তাঁর মহত্ব, তাঁর আবিষ্কার ইত্যাদি সমাজে-দেশে বা মানুষের কাছে তাৎপর্যবহ মনে হয় এবং বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জীবনীরথের কোনো ক্ষেত্রে যিনি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, সাধারণ ব্যক্তির চেয়ে যিনি কিছুটা অসাধারণ, যাঁর আদর্শকে অন্যেরা অনুসরণ করতে পারেন তাঁর জীবন রচনাই আবশ্যক বলে গণ্য হতে পারে।

আত্মজীবনী বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আত্ম অর্থাৎ নিজের জীবন-কথা কেউ যখন নিজেই রচনা করেন তখন তা আত্মজীবনীর পর্যায়ভুক্ত হয়। যে কোনো ব্যক্তিরই নিজের জীবন-কথা নিয়ে আত্মজীবনী লিখবার অধিকার আছে। এই জীবন-কথা সমাজ বা দেশ বা মানুষের কাছে মূল্যবান তাৎপর্যবহ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

জীবনী রচনা করার সময় জীবনীকারকে স্বল্প তথ্য, মানব চরিত্রাভিজ্ঞ, সমাজের পটভূমিকা, আশা বা প্রেরণা কালানুক্রমিকতা জীবনীর এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। অন্যদিকে Bernard shaw তিনটি বিষয়কে আত্মজীবনী লেখার ত্রুটি বলে উল্লেখ করেছেন— (i) Egoism (অহংকার), (ii) Self defence (আত্মরক্ষা), (iii) Pedagogy (নীতি বা উপদেশ প্রদান) — তাঁর মতে এই তিনটি বিষয় যে আত্মজীবনীতে থাকবে তাকে সার্থক আত্মজীবনী বলা যাবে না। তবে প্রসঙ্গত এও বলতে হয় যে, জীবনীর মধ্যে আবার দুটি বিভাগ ইংরেজিতে আছে। একটি হচ্ছে Hagiography অর্থাৎ সাধকের জীবনী বা মহাপুরুষের জীবনী ও অন্যটি হচ্ছে Biography অর্থাৎ যে কোনো সাধারণ মানুষের জীবনী।

ব্যক্তির প্রকাশকে সমাজের পটভূমিকায় তুলে ধরেন জীবনীকার। জীবনীতে জীবন বৃত্তান্তের ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু জীবন ব্যাখ্যার অবকাশ কম। আত্মজীবনীর মূল কথা জীবন ব্যাখ্যা। আত্মজীবনী শুধু ইতিহাস নয়, আত্মজীবনী ঘটনার পরম্পরারহিত ধারাবাহিত জীবনকথাও নয়, আত্মজীবনী মানুষের হয়ে ওঠার কাহিনি। জীবনীতে জীবনের আম-মহলের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, কিন্তু খাস মহলের দ্বার থেকে যায় যবনিকার অন্তরালে। আত্মজীবনীতে খাস মহলের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনী গ্রন্থ হল— বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', Boswell-এর 'The life of Doctor Tohnson' ইত্যাদি। অন্যদিকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আত্মজীবনী গ্রন্থ হল — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত', রাজসুন্দরী দাসীর 'আমার জীবন', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত', St. Augustine-এর 'Confessions' ইত্যাদি।

বাংলায় আত্মজীবনী রচনার তিনটি ধারা লক্ষ করা যায় —

(ক) ব্যক্তিগত তথ্যজীবনাশ্রয়ী — বিদ্যাসাগর, রাজসুন্দরী দাসী, নবীনচন্দ্র সেনের আত্মচরিত এই ধারার অন্তর্ভুক্ত।

(খ) সমাজ সাপেক্ষ ব্যক্তিজীবনাশ্রয়ী — দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্ররায়ের 'আত্মচরিত',

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন রঙ্গসমাজ', রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' এই ধারায় অন্তর্ভুক্ত।

(গ) ব্যক্তির অন্তর্জীবনাশ্রয়ী — দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, কেশবচন্দ্র সেনের 'জীবনবেদ' ইত্যাদি এই ধারার অন্তর্ভুক্ত।

১.৩ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জীবন-আলেখ্য

গায়ে শাল চাদর দেওয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার যে আবক্ষ চিত্রটি আজকাল প্রচলিত, সেই চিত্রে তাঁর ভাব-ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ভারতীয়। সত্যিকারেই লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জন্ম অসমের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতা দীননাথ বেজবরুয়া একজন রাজ-স্বীকৃত বৈদ্য ছিলেন। দীননাথ বেজবরুয়ার ছিল এক ভরা পরিবার। তেরোজন সন্তানের মধ্যে লক্ষ্মীনাথ ছিলেন পঞ্চম। লক্ষ্মীনাথের মাতা থানেশ্বরী দেবী দীননাথের দ্বিতীয়া পত্নী। লক্ষ্মীনাথের জন্মকালীন মুহূর্তটি ছিল এক স্মরণীয় ঘটনা। বেজবরুয়া তাঁর 'আমার জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, কোন সালের কোন তারিখে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তা তাঁর মনে নেই। সেকথা বাবা-মার মুখে শুনলেও ভুলে গেছেন। তিনি বড় হয়ে নিজের মনেই একটা সালের কথা কল্পনা করে নিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ না দিলে যে সব জায়গায় নেহাতই কাজকর্ম চলে না, সেসব জায়গায় কাজে লাগানোর জন্য এই কল্পিত তারিখ। সেটা ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাস। এই পৃথিবীতে তাঁর আগমন উল্লিখিত সালটির দু-ছার বছর আগে বা পরে হলেও হতে পারে। তাঁর আসল যেদিন জন্মগ্রহণ — তার সঠিক খবর শুনে বা জেনে লোকসমাজের কী-ই বা লাভ-লোকসান বা উপকার-অনুপকার হবে, তা তিনি বুঝতে পারেননি।

তাঁদের পরিবারে কারো যে জন্মপত্রিকা বা কোষ্ঠী করা হয়নি, তা নয়, বরং এই রীতিই নিখুঁত ভাবে প্রচলিত ছিল। পূর্বপর প্রচলিত প্রথা মতে তাঁর কোষ্ঠীও করিয়েছিলেন পিতৃদেব সেই কোষ্ঠী বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কোষ্ঠীর মতো অতি যত্ন করে এবং সাবধানে একটা পোঁটলার মধ্যে যে বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেকথাও নিশ্চিত তিনি জানতেন। কারণ তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন সেই পোঁটলাটি। বাবার হুকুম ছিল না বলে ছেলেমেয়েরা সেই পোঁটলাটি ঘাঁটাঘাটি করতে পারতেন না। পিতৃদেবের প্রতি তাঁদের অশেষ ভয় ও ভক্তি ছিল। তিনি যদি কোনো কাজ করতে তাঁদের বারণ করতেন তা তাঁরা মোটেও করতেন না। তবুও একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, তাঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ দু-একজন লুকিয়ে চুরিয়ে কখনো-সখনো সেই পোঁটলারূপী জ্ঞানবৃক্ষের স্বাদ যে একেবারে আহরণ করেননি তা নয় বরং সেই ফালের এক- আধটুকরো তাঁরাও যে পাননি— এমন কথা হলফ করে বলা যাবে না। কিন্তু পিতৃদেব পরলোকগমন করার পর কোষ্ঠীর সেই পোঁটলাটি কোথায় যে হারিয়ে গেল, আজ অবধি তার কোনো হদিশ মেলেনি। এইসব কারণে তিনি তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে এই অজ্ঞতার ইতিবৃত্ত এবং স্বেচ্ছাকৃত কৈফিয়ৎ

দিয়েছেন। তাঁর জন্ম কোথায় ঘটেছিল, সেটাও তিনি ঠিক করে বলতে পারেন না। তবে তাঁর জন্ম বিবরণের শোনা কাহিনি তিনি যে তার জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন, তা নিচে উদ্ধৃত করা হল —

লক্ষ্মীনাথের পিতা মুন্সেফের কাজে নগাঁও থেকে বরপেটা বদলি হয়ে নৌকো করে যাচ্ছিলেন। তখনকার দিনে অসমে আজকের মতো জাহাজ চলাচল করত না। তখন সন্ধ্যেবেলা। আঁহতগুড়ি নামে একটি জায়গাতে নদীর কিনারে নৌকা বাঁধা হল। থানেশ্বরী দেবী বালির চরে কিছুটা কাপড় আড়াল করে দিয়ে তার ভিতর রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করতে ঢুকলেন। এমন সময় তাঁর শরীর অসুস্থ বোধ হওয়াতে তিনি নৌকার ভিতর ঢুকে গেলেন। আজকের এই জীবনস্মৃতির লেখক তখনকার কোনো এক শুভ মুহূর্তে ভূমিষ্ঠ না হয়ে নৌকায় জন্ম নিলেন। সেদিন ছিল লক্ষ্মীপূর্ণিমা, তাই লেখকের নামকরণ করা হয়েছিল লক্ষ্মীনাথ। অসমে ছেলে জন্মগ্রহণ করলে উলু দেয়, শঙ্খ ঘন্টা বাজায়। মেয়ে জন্মালে ঢেঁকি ভানে, কুলো বাজায়। প্রবাসে এই বালুর চরে তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে কে কী করেছিল তা তিনি জানেন না, তবে লক্ষ্মীনাথের একজন দাদা নাকি আনন্দে পিছনে হাত চাপরাতে চাপরাতে নেচে বলেছিলেন — "আজ থেকে আমরা পাঁচজন হলাম"। একথা তিনি অবশ্য জানতে পেরেছিলেন বড়ো হওয়ার পর।

১৮৭৪ সালে লক্ষ্মীনাথ পিতার সঙ্গে লক্ষ্মীমপুরে যান। সেখানেই তাঁর বিদ্যারম্ভ। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শিবসাগর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করে তিনি পড়াশুনার জন্য কলকাতায় যান। তার দুবছর পড়ে তিনি যখন এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন তিনি উপলব্ধি করলেন, তিনি আর সেই আগেকার ছোটো ছেলে নন; বড়োদের দলে 'প্রমোশন' পেয়ে গেছেন। অতএব ছোটোবেলাকার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে এরপর আর কোনো বাধা থাকবে না, আশা করে নিলেন। তাই কলকাতা থেকে কোষ্ঠীখানা চেয়ে বাবাকে চিঠি লিখলেন। কিন্তু এফ.এ. পাস করেই যে তিনি স্বাধীন হয়ে গেছেন, একথা ভাবতে বাবার বিশেষ আপত্তি না থাকলেও তাঁর চিঠিতে কী যে দূরদৃষ্টির আভাস পিতৃদের দেখতে পেয়েছিলেন — যার ফলে তাঁকে ভুল বুঝলেন এবং ভেবে নিলেন মনে মনে লক্ষ্মীনাথ বিলেত যাবার ফন্দি এঁটেছেন। আর সেই কারণেই হয়তো বা তাঁর কোষ্ঠীর এত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কাজেই চিঠির জবাবে কোষ্ঠীর পরিবর্তে পেলেন বকুনি ও বিলেত যাবার বিরুদ্ধে শুনতে হল অলঙ্ঘনীয় নিষেধাজ্ঞা। তবে এই কোষ্ঠী চাওয়ার ব্যাপারে তাঁর যে কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না সেকথা এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীনাথ কলকাতার অ্যাসেমব্লি কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরেন। অন্যান্য ছাত্রদের মতো বছর বছর বাড়ি যাওয়ার অভ্যাস ছিল না তাঁর। বাড়ির প্রতি যে তাঁর মমতা কম ছিল তা নয়, বছর বছর বাড়ি গেলে টাকা বেশি খরচ হবে বলে সেই ভয়ে যেতেন না। আর একটা কারণ — পরীক্ষার পর অবসর সময়ে কলকাতা থেকে কলেজের চার দেওয়ালের বাইরে অন্যান্য উপযোগী জায়গাগুলো দেখে জ্ঞান

অর্জন করার বাসনা। মাসখানেক শিবসাগরের বাড়িতে থাকার পর একদিন তাঁর নামে একটি টেলিগ্রাম এল। তাঁর একজন দাদা পথে পিয়নের হাত থেকে টেলিগ্রামখানা নিয়ে দৌড়ে এসে তাঁকে বলেন — 'Lakshmi you are graduated'। অর্থাৎ লক্ষ্মী তুমি গ্রাজুয়েট হয়েছ। তিনি টেলিগ্রামখানা তাঁর হাত থেকে নিয়ে পড়লেন; তাতে লেখা আছে 'Lakshmi and Kailas are graduated'। কৈলাসচন্দ্র শর্মা বরুয়া ছিলেন নগাঁও-এর ছেলে। সেই সময় তাঁর মনে কি পরিমান আনন্দ হয়েছিল তা অনুমান সাপেক্ষ। কারণ, সেই সময়ে বি.এ. পাস করাটা ছিল একটা অসাধারণ ব্যাপার। সুবিখ্যাত জগন্নাথ বরুয়া তখন আসামে বি.এ. জগন্নাথ। যদিও আনন্দরাম বরুয়া তার আগেই বি.এ. ডিগ্রী পেয়েছিলেন, তথাপি আনন্দরাম সিভিল সার্ভিস পাস করে সিভিলিয়ান হয়েছিলেন বলে সেই খ্যাতি তলিয়ে গিয়েছিল আর তাঁর সিভিলিয়ান খ্যাতিটাই ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। তখন আসাম গভর্নমেন্ট বি.এ. পাস ব্যক্তিকে নিজে সেধেই সরকারি চাকরি দিত। আর সে যা তা চাকরি নয় — একস্টা অ্যাসিস্ট্যান্টের পদ, অবশ্য পবেশনরি। লক্ষ্মীনাথকেও একবার কি দুবার সেই পদ দেবার জন্য সেধেছিল, কিন্তু তিনি সেই চাকরি নিলেন না। তখন তাঁর অন্তরে এই ভাব খেলত যে, স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করে একমুঠো ভাত খাবে, পরের গোলামি করে নয়। তাই বি.এ. পাস করার পর কলকাতা হাইকোর্টে উকিল হওয়ার জন্য তিনি রিপন কলেজের ল-ক্লাসে ভর্তি হলেন।

বি.এ. পাস করার পর থেকেই তাঁর কাঁধে একটা জিনিস চাপল আরাবিয়ান নাইটসে দেখা বাগদাদের সাউদ সিন্ধাবাদের কাঁধে ওঠা লোকটার মতন। সেটা হচ্ছে বিয়ে। কাব্যে আর উপন্যাসে মৌখিক দানপত্রে বিয়ের যৌতুকস্বরূপ দিতে চাওয়া জিনিসগুলো তখন তাঁর মনকে রাঙিয়ে না দিত, এমন নয়, তবুও যাকে বিয়ের হাওয়া বলে, সে হাওয়া যে অনেক দিন ধরে তাঁর গায়ে লেগেছিল তা নয়। বিপদ বুঝে পাগলপারা দক্ষিণের বাতাস যাতে তাঁর ঘরের দরজা দিয়ে ঠেলে ঢুকতে না পারে তার চেষ্টা করেছিলেন অনেক। তিনি সংকল্প করেছিলেন যে পড়াশুনা শেষ করে যখন রোজগার করতে পারবেন আর সহধর্মিণীকে খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখতে পারবেন, তখনই তিনি বিয়ের ভাবনা ভাববেন। সেই সংকল্প বেশিদিন ঠেকেনি। বাইরে থেকে দমকা বাতাস এসে তাঁর মনের সমস্ত ভাবনাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে 'ম্যান প্রোপোজেস, গড ডিসপোজেস'। ঈশ্বরের ইচ্ছার সামনে তিনি তো একটা খড়কুটো। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ১১ তারিখ জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের মেয়ে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। প্রজ্ঞাসুন্দরী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বেজবরুয়ার প্রথম কন্যা সন্তান সুরভির জন্ম হয়। সুরভির জন্মের প্রায় একমাস আগে আসামের কমলাবাড়ি সত্রে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে লক্ষ্মীনাথের পিতা দীননাথ বেজবরুয়ার পরলোক গমন করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর কলকাতার জোড়াসাঁকো বাড়িতে তাঁর দ্বিতীয়া কন্য অরুণার জন্ম হয়। তবে বিধির নিষ্ঠুর বিধানে তাঁর প্রথম কন্যা মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে।

প্রবাসে থাকার সময় থেকেই লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর জীবনী লেখা শুরু

করেছিলেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই জীবন-কাহিনি লিখেছিলেন। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই তিনি প্রকৃত জীবন-কাহিনি শেষ করেছিলেন। ১৯০১ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত কেবল মাত্র ব্যবসায়ের হিসাব এবং অন্যান্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর লেখা ডায়েরির পাতা শোকাবহ হয়ে ওঠে বলে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসের ২৬ তারিখে এই সাহিত্যরথী পরলোকগমন করেন।

১.৪ শিক্ষা জীবন

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া সেদিন শুনতে পেয়েছিলেন, তাঁর পড়াশুনা শুরু করা হবে, সেদিন তিনি ভীষণ আনন্দিত হলেন। কারণ, বই পড়তে পারবেন, লোককে চিঠি লিখতে পারবেন। তাই শুভ দিন-ক্ষণ দেখে কাজ সুসম্পন্ন করা হল। বেজবরুয়া 'আমার জীবনস্মৃতি'-তে উল্লেখ করেছেন — "আমাদের গুরুর বাড়ি কমলাবাড়ি সত্রে সোনার ফুল উৎসর্গ করে, বাড়িতে ব্রাহ্মণ আনিয়ে পুজোপালা করে, নাম কীর্তন, ঘরে পুজোর ডালি দিয়ে সবাই মিলে ঠাকুরের নাম করতে থাকি। নাম শেষ হলে রবিনাথ দাদা আমাকে একান্তমনে আশীর্বাদ করলে যে, আমি যেন সর্ববিশারদ হয়ে আমাদের বংশের নাম উজ্জ্বল করতে পারি।"

দাদা গোড়ায় গোড়ায় তাঁকে কলাপাতার উপর 'ক' 'খ' লিখতে শিখিয়ে দিলেন। রোজ কেমন করে কলাপাতা কেটে এনে তার ধুলো মাটি মুছে পরিষ্কার করে নিয়ে তার উপর অক্ষর লিখতে হয়, সে সবও দেখিয়ে ছিলেন। কলম তৈরি করে নিয়ে মাটির পাত্রে লেগে থাকা ছাইতে গোমূত্র মিশিয়ে কীভাবে কালি তৈরি করে নিতে হয় এবং কালি ভরে রাখার জন্য কী করে বাঁশের চোঙার দোয়াত বানিয়ে দোয়াতগুলোতে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হয়, এই সমস্ত কলাকৌশল তাঁকে শিখিয়ে দেন রবিনাথ দাদা। ক, খ লিখতে পড়তে শেখার পর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বাংলা শিশুশিক্ষা পড়তে দেওয়া হল। কারণ তখনকার দিনে অসমের বিদ্যালয়সমূহে বাংলা ভাষা শেখানো হত। এরপর তাঁকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। পিতৃদেব যদিও অতি নিষ্ঠাবান পুরোনো ধরনের হিন্দু ছিলেন, তবুও তাঁর মন আশ্চর্য ধরনের উন্নত ছিল। তিনি যখন দেখলেন যে জল থেকে মাছ ভাঙায় তুললে যে অবস্থা হয়, ইংরেজ রাজত্বে বাস করে ইংরেজি ভাষা না জানলে সেই একই অবস্থা হয়, তখন তিনি নিজেও একটু আধটু ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেন ও ছেলেমেয়েদেরও ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দেন এবং ইংরেজি শিখতে উৎসাহ দেন। তখন লখীমপুরে কোনো ইংরেজি স্কুল ছিল না বলে পিতৃদেব তাঁদের ইংরেজি শেখার জন্য একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন। সেই স্কুলে লক্ষ্মীনাথ, তাঁর বড়ো দুই ভাই ও তাঁর চেয়ে বড়ো একজন ভাগ্নে শিক্ষা লাভ করেন। স্কুলে পড়াবার জন্য পিতৃদেব শিবসাগরের তীর্থনাথ উকিলের পুত্র পদ্মনাথ শর্মা নামে তাঁদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় একজনকে এনে বাড়িতে রাখলেন। দু-তিনিজন ইংরেজি জানা লোককে জোগাড় করে

এনে তাঁদের মাস্টারও নিযুক্ত করেন।

লখীমপুর থেকে পিতৃদেব বদলি হয়ে আসেন গুয়াহাটিতে। গুয়াহাটিতে এসে লক্ষ্মীনাথ প্রথম স্কুলে যেতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম স্কুলটা তাঁর যেন জেলখানার মতো মনে হত। স্কুলে মাত্র চার-পাঁচ ঘন্টা থাকলে কি হবে, অতক্ষণ ওখানে থাকতে তাঁর মনে হত তিনি যেন খাঁচার পাখি। আবার কালকে স্কুলে যেতে হবে, এই চিন্তাই তাঁকে যেন মনমরা করে তুলত। কিন্তু পিতৃদেবের হুকুম, স্কুলে যেতেই হবে। ঝড় হোক, জল হোক যেতেই হবে। স্কুলে গিয়েই দেখতেন ছাত্রদের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে বেত হাতে নিয়ে মাস্টার মশাইদের গুরুগম্ভীর আওয়াজ স্কুলবাড়ির শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেচে। তখন তাঁর কাহিল অবস্থা। স্কুলে ঢুকলেই তাঁর এমন অবস্থা হত যে, কোনো কিছু শেখা বা বোঝা তো দূরের কথা যেটুকুও বাড়ি থেকে শিখে আসতেন তাও ভুলে যেতেন। স্কুলটা যদি ভয়ের কারণ না হয়ে আনন্দের কারণ হতো, তাহলে দেশে কত না সুস্থ সবল দেহের ও মনের ছেলে গড়ে উঠতে পারত।

বেজবরুয়া লিখেছেন, "আমাদের স্কুলে একজন অঙ্কের মাস্টার ছিলেন, তাঁর নামটা (যদিও আমি ভুলে যাইনি) সাখাওত আলি। তাঁকে দেখলেই আমার মাথায় অঙ্কগুলো সব যেন গোলমাল হয়ে যেত। মুন্সী সাহের তাঁর লাল চোখ আর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিয়ে যত উত্তরের আশা করতেন ততই তিনি নিরাশ হতেন আমার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে। মোটের উপর এই কথা বলতে পারি যে গৌহাটির স্কুল আমার পক্ষে আনন্দালয় না হয়ে যমালয় হয়ে উঠেছিল।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, লক্ষ্মীনাথকে প্রথমে বাংলা স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছিল। এরপর তাঁকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করানো হয়। শ্রীযুক্ত লোকনাথ শর্মা (ডাক নাম টেপু) নামে তাঁদের এক ভয়ানক নিয়মপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। ছেলেদের পড়াশুনার চেয়েও নিয়ম শৃঙ্খলার দিকে তিনি নজর দিতেন বেশি। স্কুলের বা বাড়ির নিয়ম শৃঙ্খলা যাতে ছেলেরা ঠিকভাবে পালন করে তার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। নিজের বাড়িতে কোনো ছাত্র যদি নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে কোনো কাজ করে, যেমন দাদার সঙ্গে মুখে মুখে উত্তর করা, কিংবা বড়োদের কোনো কাজ না করে গাফিলতি করা ইত্যাদি কোনো অভিযোগ ওঁর কাছে এলে তিনি তখন হয় বেত মেরে, নাহলে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে শাস্তি দিতেন। তিনি ক্লাসে বসে যখন ছাত্রদের মারবার জন্য মুখখানা বেঁকিয়ে দিতেন বা ঠোঁট দুটো ফুলিয়ে অঙ্গভঙ্গি করতেন তখন ছাত্ররা হাসি থামাতে পারত না। কিন্তু লোকনাথ শর্মা মোটের উপর আমুদে লোক ছিলেন। শ্রীযুক্ত ধর্মেশ্বর নামে আরেকজন মাস্টার ছিলেন। তিনি অত কড়া ছিলেন না যদিও, তাঁর পড়ার মাত্রাটা এত বেশি ছিল যে ছাত্ররা তাঁকে কষ্ট করে সহ্য করত। তাঁর মাথায় টাক ছিল এবং সেজন্য তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে টাকমাথা বলে ডাকত। মতিলাল ঘোষ নামে এক ছাত্র প্রথম শ্রেণিতে অর্থাৎ এন্ট্রাস ক্লাসে পড়তেন। তাঁকে মাঝে মাঝে হেড মাস্টারমশায় লক্ষ্মীনাথদের ক্লাসে পড়াবার জন্য পাঠাতেন। যখনই তিনি ক্লাসে আসতেন, তখনই কাউকে না কাউকে হয় বেঞ্চের

উপর দাঁড় করিয়ে দিতেন, নয়তো ক্লাসের বাইরে বের করে দিতেন। লক্ষ্মীনাথরা উঁচু ক্লাসে ওঠার পর গোপালচন্দ্র ঘোষ নামে একজন শিক্ষক পেয়েছিলেন। তিনি রোজ ক্লাসে একটা ছাপানো মানে বই নিয়ে আসতেন এবং সেই মানে বই থেকে প্রথম থেকে সব কটি ছেলেকে পরের পর মানে জিজ্ঞাসা করে যেতেন। লক্ষ্মীনাথরাও করতেন কি প্রথম থেকে যে যেখানে বসতেন তাঁর পালায় কোন্ মানেটা আসবে সেই হিসেবে সেই মানেটা খুব ভালো করে মুখস্থ করে নিতেন। গোপালবাবুও ছাত্রদের নির্ভুল উত্তর পেয়ে ভাবতেন যে তাঁরা তাঁর লেসন খুব ভালো করেই শিখে থাকে। একদিন তিনি সেই চিরাচরিত প্রথানুযায়ী মানে জিজ্ঞাসা না করাতে ছাত্ররা হঠাৎ হতবুদ্ধি হয়ে হকচকিয়ে গেল। লক্ষ্মীনাথের কাছ থেকে যা তা উত্তর শুনে তিনি তাঁকে তিরস্কার করে বলেন, "আজকে মদৎখানার থেকে এইদিকে হাওয়া বয়নি বুঝি?" তিনি যদিও তখন সেই তিরস্কারের মানে বোঝেননি, তবুও ভাবলেন যে মাস্টার মশায় তাঁকে খুব কথা শুনিয়েছেন। শ্রীযুক্ত তোয়ধর শর্মা পণ্ডিত নামে এক শিক্ষক তাঁদের সংস্কৃত পড়াতেন। তিনি সাজপোশাক করতেন পুরানো প্রথা মতো। একদিন তিনি মুগার ধুতি পরে আসাতে ছাত্রদের মধ্যে থেকেই একটি মুখরা ছেলে বলে ফেলে — আজকে স্যার মুগার ধুতি পরে এসেছেন। এই কথা শুনে পণ্ডিতের বড়ো রাগ উঠে গেল, তিনি তক্ষুনি বলেন — তোর বাবার পয়সার ধুতি পরে এসেছি না কি? এই কথা শুনে ছাত্ররা তা দমলই না উল্টে সবাই মিলে খিক্‌খিক্ করে হাসতে লাগল। দুঃখের বিষয় তাদের মধ্য লক্ষ্মীনাথও ছিলেন। পণ্ডিত অন্যদের ছেড়ে দিয়ে, লক্ষ্মীনাথের দিকে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, "তুমি সিংহাশাবক হয়ে শৃগালের মতো আচরণ করছ কেন।" সেই তিরস্কার শুনে তিনি লজ্জায় মাথা নিচু করলেন।

খুবই আশ্চর্যের কথা যে, এত শিক্ষকের অধীনে লক্ষ্মীনাথের বিদ্যা ঘটলেও, একজনও তাঁর মনকে আকর্ষণ করতে পারেননি— প্রকৃত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসায়। এটা হয়তো শিক্ষকদের ত্রুটির চেয়ে তখনকার দিনের শিক্ষা প্রণালীর দোষ বলেই ধরা যায়। অবশ্য মাসখানেকের জন্য এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল। শ্রীযুক্ত কেশবনাথ ফুকন মাসখানেক তাঁদের স্কুলে পড়িয়েছিলেন। তিনি এত সুন্দর প্রাঞ্জলভাবে পড়াতেন যে বলা যায় না। তাঁর মিষ্টি মধুর ব্যবহারে ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি স্কুলে বেশিদিন ছিলেন না।

তাঁদের স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর সম্পর্কে তিনটি কথা মনে আছে। তাঁর গোঁফ ছিল সর্বসাধারণের গোঁফের চেয়ে লম্বা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, তিনি নাকিসুরে কথা বলতেন আর প্রত্যেক কথার শেষে 'অকর্স' (অফ কর্স) শব্দটা এত ব্যবহার করতেন যে শিবসাগর জেলার গোয়ালারা যেরকম দুধে তিনভাগ জল মেশায়, তিনিও তেমন কথার প্রায় তিনভাগে অকর্স কথাটা বলতেন। তৃতীয় কথাটা হল তিনি যে অন্যের চেয়ে ভালো ইংরেজি জানেন তা দেখাবার জন্য দেশের লোকের সবার ইংরেজির ভুল ধরতেন। তাঁদের হেড মাস্টারের নাম ছিল শ্রীশ্রীনাথ গুহ। এগারোটা থেকে চারটে অবধি তিনি ক্লাস না নিয়ে স্কুলের এক পাশে একটা ডেস্কে বসে অফিসের

কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন আর মাঝে মাঝে বলতেন 'সাইলেন্স'। শ্রীনাথ বাবু 'সাইলেন্স' গর্জনের মানে হচ্ছে — ছাত্ররা তোরা ভাবছিস যে তোদের হেডমাস্টার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছেন, আর তোদের দিকে নজর দিচ্ছেন না। তা নয়, তাঁর দৃষ্টি সজাগ। ক্লাসের কোনো ছেলের বিন্দুমাত্র ব্যবহারে ব্যতিক্রম ঘটতে দেখলে তিনি 'ইউ' 'ইউ' বলে তাকে কাছে ডেকে নিয়ে, এহাত ওহাত পাততে বলতেন আর বেত মেরে তিনি বুঝিয়ে দিতেন তাঁর সবার উপরেই সতর্ক দৃষ্টি। এই বেতের বাড়ি একদিন লক্ষ্মীনাথের ভাগ্যেও জুটেছিল। তাঁদের ক্লাসে মহীকান্ত বলে একজন দুষ্ট ছেলে ছিল। সে তাঁর অমত ও আপত্তি অগ্রাহ্য করে তাঁর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লাগল। এই পাঞ্জাযুদ্ধ হঠাৎ হেডমাস্টারের চোখে পড়তে তিনি প্রচণ্ড চিৎকারে 'ইউ' বলে সেই লড়াই থামিয়ে দেন। ফিরে দেখেন হেড মাস্টার শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে 'ইউ' বলেছেন। উনি, প্রধান যে দোষী তার দিকে না তাকিয়ে শুধু লক্ষ্মীনাথের দিকে তাকিয়েছেন। এরকম অবিচার দেখে তাঁর মনে ধিক্কার জাগল। তিনি ক্লাসে এসে হিতোপদেশের এই শ্লোকটা নিজের শ্লেটে লিখলেন — 'ন স্থাতব্যং ন গন্তব্যং দুর্জনেন সমং ক্বচিৎ।' দুর্জনের সঙ্গে থাকলে গাছের ডালে কাকের সঙ্গে হাঁস বসলে যে মজা হয় সেরকমটি ঘটে।

শ্রীনাথবাবুর মৃত্যুর পর হেড মাস্টার হলেন চন্দ্রমোহন গোস্বামী। সর্ববিষয়ে ওঁর মতো এমন প্রগাঢ় পণ্ডিত আসামে হেডমাস্টার হিসেবে কখনও কাজ করেননি। চন্দ্রে কলঙ্কের মতো চন্দ্রমোহনের চরিত্রেও একটি কলঙ্ক ছিল — সেটা অতিরিক্ত মদ্যপান। চাঁদের মতো চন্দ্রমোহনেরও মাসে দুপক্ষ ছিল— একবার মদ খেতে শুরু করলে এক নাগাড়ে পনেরো দিন ধরে তিনি মদ পান করবেন, তারপর দিন পনেরো একেবারে শুকনো খট্‌খটে। তিনি যখন মদ খেতেন না সেই সময়টুকুকে লক্ষ্মীনাথ শুক্লপক্ষ বলতেন আর বাকি সময়টুকু কৃষ্ণপক্ষ। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কৃষ্ণপক্ষেও তিনি এক একদিন হঠাৎ উদয় হতেন আর ছাত্ররা তাঁর স্ফূর্তির চোটে বেশ মজা উপভোগ করত। একদিন তিনি তাঁর কৃষ্ণপক্ষের সময় হঠাৎ স্কুলে এসে উপস্থিত হলেন এবং সঙ্গে এলেন বাংলা স্কুলের হেডপণ্ডিত বাবু প্রাণকৃষ্ণ কর। প্রাণকৃষ্ণ বাবু নিশ্চয়ই চন্দ্রমোহনবাবুকে সামলে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে গোস্বামী মশায়ের প্যান্টের ভিতর থেকে যে ধুতির কোচা ঝুলছিল তা প্রাণকৃষ্ণ বাবুর নজর এড়িয়ে গেছে। গোস্বামী প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের নানা ধরনের প্রশ্ন করে বেড়িয়েছেন এবং প্রাণকৃষ্ণ বাবুও তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো ঘুরছেন। কিন্তু ধুতির কোচাটা জাতীয় পতাকার রূপ ধরে বৃটিশ গভর্নমেন্ট স্কুলের 'ইউনিয়ন জ্যাক' পতাকার 'স্পিরিট'কেও অগ্রাহ্য করে চলেছিল, করবাবু এটা দেখলে নিশ্চয়ই ঠিক করে দিতেন। কারণ এই দৃশ্য দেখে স্কুলের সকল ছাত্ররা ভীষণভাবে হাসাহাসি করছিল। তবে চন্দ্রমোহন বিদ্যার গৌরব অর্জন করেছিলেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো। তিনি ছাত্রদের অনেক ভক্তি, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন।

শিবসাগরে পড়ার সময় তিনি পড়াশুনায় ভালো বা মেধাবী পরিচিতি লাভ করেননি। তাই স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কারের অধিবেশনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। মাত্র একবার কীভাবে যেন তৃতীয় স্থান অধিকার করে বসলেন। পুরস্কার বিতরণের

দিন পুরস্কারটি তাঁর হাতে দেওয়ায় তিনি লজ্জায় মাথা নিচু করলেন। মাথা তুলে মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে একবার বললেন— স্যার আপনাদের কারুর ভুলভ্রান্তির জন্য এইরকম হয়নি তো। মাস্টারমশায় হেসে উত্তর দেন— না, কারুরই ভুল হয়নি।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া একবারে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করতে পারেননি। সেইসময় প্রায় সকল ছাত্ররা একটা ধারণার বশবর্তী হয়েছিল যে, এন্ট্রান্স ক্লাসে বছর দুয়েক থাকার পর তবেই এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার যোগ্য হয়। প্রথম বছর খেলাধুলায় মেতে থাকার পর দ্বিতীয় বছর পড়াশোনা আরম্ভ করলেন। পণ্ডিত হবার বাসনায় সংস্কৃত নিলেন সেকেণ্ড লাঙ্গুয়েজ হিসেবে। তাঁকে যিনি সংস্কৃত পড়াতেন তিনি যে পণ্ডিত ছিলেন এমন নয়, তাঁর বিদ্যার দৌড় দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং লক্ষ্মীনাথও মনে করলেন যে তিনি খুব সংস্কৃত শিখলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্যান্য বিষয়ে যদিও বা ডিঙিয়ে পাস করলেন, সংস্কৃততে একেবারে ফেল। দুচারজন সঙ্গী পরীক্ষায় পাস করে কলকাতায় পড়তে গেল আর তিনি পড়ে রইলেন। ফলস্বরূপে তাঁর মনে ধিক্কার জন্মাল এবং সংকল্প গ্রহণ করলেন যে সামনের বছর ভালো করে মন দিয়ে পড়ে পাস করবেনই। সেজন্য তিনি জনসাধারণের জন্য যে নামঘর আছে, সেখানে পড়বার জন্য মন স্থির করলেন। পুজোর সময় ছাড়া বাকি সময় নামঘরে এক শূন্যতা ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করত। গোরু ঘোড়াও কখনো এসে আশ্রয় নিত। তিনি নিজেই সেই নামঘরের একটা কোনের আবর্জনা গোবর ইত্যাদি পরিষ্কার করে নিয়ে কলাগাছের পাটি পেতে বসে পড়তে আরম্ভ করলেন। সকাল বেলা কাকের 'কা' 'কা' ডাকে উঠে যেতেন; অন্যান্য সকল কাজ ফেলে রেখে নামঘরে পড়তে যেতেন। সেবছরই (১৮৮৬) তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করলেন। এরপর তাঁকে কলকাতায় পড়তে পাঠানো নিয়ে বিষম সমস্যা উপস্থিত হল। বাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তিনি কলকাতায় আর একটা ছেলেকে পাঠিয়ে হারান। কারণ তাঁর মতে, আগের দুটো ছেলেকে তিনি কলকাতায় পাঠিয়ে হারিয়েছেন। যাইহোক শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন। কলকাতায় পড়তে যাওয়ার ব্যাপারে বাড়ি থেকে মত দিতে দেরি করায় কলেজে ভর্তি হতেও দেরি হয়ে গিয়েছিল। ক্লাসের পড়া অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাই অধ্যাপকের দেওয়া লেকচার অনুসরণ করতে অসুবিধা হতো রীতিমতো। বইয়ের প্রায় মাঝামাঝি অথবা শেষভাগে এসে পৌঁছেছে অন্যান্য সবাই, আর তিনি একেবারেই প্রথম দিকেই রয়েছেন। তাঁর অবস্থা তখন গোরুর গাড়িতে করে পাঠ্যপুস্তকের দেশে পৌঁছোনোর মতোই। মন ভরে গেল হতাশায়। এদিকে দিন দিন তাঁর শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরকমভাবে মাসখানেক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে তিনি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভাবলেন কলকাতায় পড়তে আসাটাই বৃথা গেল। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারলেই হয়। এভাবেই কলকাতায় পড়ার প্রথম পর্ব শেষ হল।

কলকাতা থেকে শিবসাগর ফিরে এসে তিন তিনমাস শুধু মায়ের হাতের রান্না খেলেন, মনের আনন্দে টো টো করে ঘুরে বেড়ালেন আর ঘুমিয়ে কাটালেন। যা হোক সব জিনিসেরই একটা শেষ আছে আর তাঁর এই ভবঘুরে জীবনেরও শেষ হল। নিজের মূর্খামি বুঝতে পেরে পুনরায় বাবার অনুমতি নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। এবার পরের

বাড়িতে না থেকে সোজা এসে উঠলেন একটা ছাত্রদের মেসে। সেই মেসটা ছিল ৫৩ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে। কাছেও ছিল সিটি কলেজ। তাই রিপন কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে সিটি কলেজে ভর্তি হলেন। তিনি না পড়ে পাগলামি করে কাটিয়েছিলেন ছটা মাস। সেই ছ-মাসে পড়ার যে ক্ষতি হয়েছে তা তৈরি করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। শিবসাগরে বারোয়ারি নামঘরে যেমন পড়েছিলেন, সেরকম আবার পড়তে লাগলেন। দুমাসের মধ্যেই তিনি পড়া তৈরি করে ফেললেন। অঙ্কতে তিনি একেবারেই কাঁচা ছিলেন। তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম বরুয়া, যিনি বি.এ. চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণিতে পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেলেন। পড়ার খরচ বাড়ি থেকে আনবেন না বলে লক্ষ্মীনাথ ঠিক করেছিলেন। গোড়া থেকেই নিয়মিত কলেজে না পড়ার জন্য আসাম গবর্নমেন্ট তাঁকে যে কুড়ি টাকা করে বৃত্তি দিত তা বন্ধ করে দিয়েছিল। সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর হয়ে অনেক লেখালেখি করে সেই টাকাটা উদ্ধার করে দিলেন। টাকাটা পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত মনে পড়া শুরু করলেন এবং এফ.এ. পরীক্ষা পাস করে বাড়ি রাওনা হলেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীনাথ কলকাতার অ্যাসেমব্লি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। বি.এ. পাস করার পর তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পড়ার পাশাপাশি রিপন কলেজের ল ক্লাসে ভর্তি হলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুটো পরীক্ষাতেই তিনি ফেল করেন। বি.এল. পরীক্ষায় ফেল করার কারণ হচ্ছে — পরীক্ষা দেবার পর 'সিন্ডিকেট মিটিং' করে বি.এল. পরীক্ষার পাসের ন্যূনতম নম্বরের সংখ্যাটি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরীক্ষায় যে নম্বর পেয়েছিলেন তা পাসের জন্য যথেষ্ট ছিল না। অবশ্য পুরনো নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা যে নম্বর পেয়েছিলেন তাতে পাস করে যাওয়ার কথা। ফলস্বরূপ তাঁকে নিয়ে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র ফেল করেছিল। এম. এ. পরীক্ষায় অবশ্য পড়েছিলেন ভালো করে, কিন্তু কেন যে ফেল তা পরে বুঝতে পেয়েছিলেন। সেখানে অ্যাংলো স্যাকস্ন নামে অসভ্য একটা সাবজেকট্ ছিল, (অবশ্য তাঁর জন্য সভ্য) সেজন্য তিনি তাকে অগ্রাহ্য করে ছেড়েই দিয়েছিলেন একেবারে। অথচ সেই তাঁর মাথায় মারল লাঠির কাড়ি। আঘাত পেয়ে অধ্যাপক টনি সাহেবের কাছে নিজের দুঃখ নিবেদন করেন। তিনি তাঁর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাতেই সমাপ্তি। বি.এল. পরীক্ষায় ফেল করা ত্রিশজন ছাত্রের মধ্যে কয়েকজন বেশ ভালো ছাত্র ছিলেন আর তাঁরা কলকাতার সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের সন্তান। তাঁরা ঠিক করলেন কলকাতা হাইকোর্টে কলকাতা ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করবেন, যাতে 'পাস করা' ছাত্রদের তালিকার ভেতর তাঁদের নাম নিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অনেক মামলা-মোকদ্দমা চলার পর ইউনিভার্সিটির সামনে তাঁরা হেরে যান। তাঁর উপরে মোকদ্দমার খরচের ডিক্রী দিল। যাইহোক, তাঁদের এই আন্দোলনের ফলে, তিন মাসের মাথায় ইউনিভার্সিটি আবার একটি সাপলিমেন্টরি বি.এল.পরীক্ষা নিল। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে সেই পরীক্ষা তিনিও দিতে বসলেন। কিন্তু প্রথম দিনের পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরে আর যাননি। কারণ পরীক্ষার সময় ইউনিভার্সিটির কর্মচারীগণ এমনভাবে তাঁর উপর নজর দিতে লাগলেন যে তিনি একটা দাগী চোর। প্রশ্নের উত্তর কর্মচারীর হাতে দিয়ে উঠতে যাচ্ছেন

এমন সময় অফিচার একজন এসে তাঁর কাছে মোকদ্দমার ডিক্রী খরচের টাকা দাবি করল। তিনি ভীষণ রেগে গেলেন এবং তখনই ধমক দিয়ে বললেন 'চলা যাও'। ভাবতে লাগলেন, ওঁরা আর কখনোই তাঁকে পাস করাবে না। সেই কথা চিন্তা করে কলকাতা ইউনিভার্সিটির চরণে নমস্কার জানিয়ে আর পরীক্ষা দিতে গেলেন না। এভাবেই তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্ত ঘটল।

১.৫ শৈশব স্মৃতি

লক্ষ্মীনাথের পিতা দীননাথ বেজবরুয়াকে চাকরির খাতিরে বিভিন্নস্থানে থাকতে হয়েছিল। সেইসূত্রে লক্ষ্মীনাথেরও বিভিন্ন জায়গা ও সেই সমস্ত স্থানের লোকজন, পথ-ঘাট, প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল। সেই সমস্ত বর্ণনা লক্ষ্মীনাথ খুব সুন্দরভাবে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন। লক্ষ্মীনাথ লিখেছেন — তাঁর জন্মের সময় পিতৃদের মুন্সেফের কাজে নগাঁও থেকে বরপেটা বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। বরপেটা তাঁরা প্রায় বছর তিনেক ছিলেন। বরপেটার সেই স্মৃতির মধ্যে চারটে কথা তাঁর আবছা আবছা মনে পড়ে—

প্রথমটি, বর্ষকালে শহরটি নদীর জলে ডুবে যেত। একবার সেরকম বৃষ্টি হলে তাঁদের ঘরের উঠোনে এক হাঁটু সমান জল জমে যায়। তখন তাঁরা অর্থাৎ সকল ভাই ও ভাগনেরা মিলে জলে নেমে সারাদিন একজন আরেকজনকে তাড়া করে বেড়াতেন। সন্ধাবেলা বাবা কাছারি থেকে ফিরে এই কথা জানতে পেরে তাঁদের কয়েক ঘা লাগান।

দ্বিতীয়টি, সেইরকম বর্ষায় বাবার সঙ্গে নৌকা করে কোথাও গেলে দেখতে পেতেন — দূর থেকে বন্য মোষগুলোর কালো কালো শিং আর নদীতে ওদের সাঁতার কাটার দৃশ্য।

তৃতীয়টি, পিতৃদেবের সঙ্গে প্রায়ই তাঁরা বরপেটা কীর্তনঘরে যেতেন। কীর্তনঘরে মাঝের বড় থামগুলো, প্রদীপ সাজাবার জায়গা আর বসবার চাতাল এই তিনটে স্মৃতি তাঁর খুব মনে পড়ত।

চতুর্থটি, সত্রের চাতালে সত্রের অধিকারীর ঘরের ভিতর হাতিখুজীয়া বাটিতে মোষের দুধের পাতা দৈ আর গুড় দিয়ে সুবাসিত কোমল চাল বা বোকা চাউল সহযোগে জলপান করতেন।

বরপেটা থেকে বাবা বদলি হয়ে যান তেজপুর। নৌকো করে যাওয়ার সময় মনে পড়ে, বাবা তাঁদের দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে — 'ঐ যে হাতি-মুরা পর্বত! ঐ তো পোরাপাহাড়, ঐটে শিঙ্গরি' ইত্যাদি বলতেন। একদিন তাঁদের নৌকা যখন পাহাড়ের গা ঘেঁষে বেয়ে আসছিল, তখন দেখতে পান একটি মাদী হরিণ পায়ের কাছে মরে পড়ে আছে। নৌকা কাছে আসতেই মাঝিরা হরিণটাকে নৌকাতে তোলে। দেখে অনুমান হল, কিছুক্ষণ আগেই হয়তো হরিণটা নিহত হয়েছে। কারণ তখনও হরিণার গায়ে বাঘের আঁচড়ের

দাগ। মাঝিদের তো মহা আনন্দ যে ওরা একটা গোটা হরিণের মাংস পেট ভরে খেতে পারবে। তাঁর মনেও সেরকম ভাবনা আসেনি তা নয়; কিন্তু অভিলাষ পূর্ণ হল না — হল মাঝি-মাল্লাদের। কারণ হরিণটা মাদী, বাবা সেজন্য খেতে দেননি।

তেজপুরে এসে কোথায় উঠেছিলেন, কার ঘরে ছিলেন আর কখন যে নিজেদের আলদা বাড়িতে চলে এলেন সেসব কথা তাঁর কিছুই মনে নেই। কেবল মনে আছে তেজপুরের পাহাড়ের উঁচু নিচু টিলা আর লাল মাটির রাস্তাঘাট। তেজপুরের আরও কয়েকটা কথা তাঁর মনে আছে। যথা — (ক) তাঁদের বাড়ির কাছেই একটুকরো খোলা জায়গাতে সুন্দর সুগন্ধ ফুলে ভরা বন্য 'ঢেপাইতিতার' গাছগুলো। (খ) বাবার সঙ্গে তাঁদের নিকামূল সত্রে যাওয়ার কথা। (গ) তেজপুরে কুমোরদের একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের কুমোরেরা প্রায়ই আসত তাঁদের বাড়ি আর তাঁদের জন্যে নিয়ে আসত মাটির ঘুন্টি আর খেলনা। (ঘ) তাঁর ভাই লক্ষ্মণের জন্ম হয়েছিল তেজপুরে, লক্ষ্মণ জন্মবার দিন চারেক পরেই আহিনী নামে তাঁদের এক পরিচারিকার একটি ছেলে হয়। লক্ষ্মণকে যখন বিলিতি 'পেরাম্বুলেটর' বা শিশু ঠেলাগাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত তা দেখে আহিনীর ছেলে টৌরামও সেই ঠেলাগাড়িতে ওঠার জন্য বায়না করে কান্না করত। সেজন্য বাবা একজন ছুতোর ডাকিয়ে কাঠের তক্তার তৈরি খোলা কাঠের গাড়ি একটা ওকেও করিয়ে দেন। সেই গাড়িতে উঠে টৌরামের যে কী আনন্দ হতো তা বলা যায় না, আর তা দেখে বাবাও মহা আনন্দ পেতেন।

রবিনাথ মাজুদলর বরুয়া নামে এক দূর সম্পর্কের দাদু তাঁদের সর্বদা তত্ত্বাবধান করতেন। সম্পর্কে তিনি যদিও দাদু বয়সে কিন্তু বাবার থেকে অনেক ছোটো ছিলেন। তিনি তাঁদের খেলার সঙ্গী, অভিভাবক, গল্পের থলে আর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ আদি কাহিনির বটুয়া ছিলেন। পুরাণের কাহিনি ব্যতিরেকেও রাজা-রাজরা এবং ভূত-প্রেতের গল্প বলে আনন্দ দিতেন ও ভয়ও দেখাতেন। তাঁরা কাঁদলে তিনি 'বড়ো বুড়ো', 'মাজু বুড়ো', আর 'সরু বুড়ো' অর্থাৎ ছোটো বুড়ো — এই তিন বুড়োর গল্প এমন রঙ চড়িয়ে ভয়ঙ্কর করে বানিয়ে বলতেন যে তাঁরা কান্না ছেড়ে দিয়ে ভয়ে কাঁচুমাঁচু। একদিন রাস্তা দিয়ে এক অদ্ভুত পোশাক পরা এক বুড়োকে দেখতে পেয়ে এমন ভয় পেয়েছিলেন যে প্রায় মাসখানেকের জন্য তাঁরা কান্নাকাটি, বদমায়েসি, দুষ্টমি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। তখন দাদুকে অনুনয় বিনয় করে বলেন তিনি যেন মেজ বুড়োকে তাদের ধরে না নিতে বলেন। কিন্তু সেই ভয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অচিরেই তাঁদের কোমল হৃদয়ে সঞ্চিত 'মাজু বুড়ো' সম্পর্কীয় বিভীষিকা কোথায় যে উড়ে গেল। এরপর থেকে দাদু যখন বলতেন মাজুবুড়ো এসেছে তাঁরা লাঠিসোটা নিয়ে ছুটতেন তাকে খতম করার জন্য। সুযোগ পেলে তাঁর দাদুকেও ঠাট্টা করতেন। একদিন দাদুর মাথায় দু-একটা পাকা চুল আবিষ্কার করে তৎক্ষণাৎ দাদুর কাছ থেকে সরে এসে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে গাইলেন — 'দাদু বুড়ো হয়েছে, দাদু বুড়ো হয়েছে'। দাদু তক্ষুনি তাঁদের দিয়ে পাকাচুলগুলো উঠিয়ে ফেললেন। সেদিন থেকে তাঁরা ছড়া কেটে দাদুকে রাগাতেন; আর উনি যখন তাঁদের দিকে তেড়ে আসতেন, তখন তাঁরা খিল্ খিল্ করে হেসে পালিয়ে যেতেন।

দাদুকে বাবা নাম ধরে না ডেকে মাজুদলর বরুয়া বলে ডাকতেন। ঠাকুরঘরে মূর্তি ও শালগ্রাম শিলা পুজো করার ভার ছিল দাদুর উপর। ঠাকুরঘরে নাম-প্রসঙ্গ শেষ হলে তিনি অনেক বিস্তারিত পাঠ ও আশীর্বাদ পাঠ শোনাতেন। সকালে দাদু কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। অথচ বাবা খুব ভোরে উঠতেন, ব্রাহ্ম মুহূর্তেই তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। বেলা অবধি কাউকে ঘুমোতে দেখলে বড়ই অসন্তুষ্ট হতেন। দাদু বেলা অবধি ঘুমুতেন বলে তাঁকে বকুনি দিয়ে ঘুম থেকে ওঠানো বাবার একটা নিত্যকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সময়ে বাবা দাদুকে 'ঘুম কাতুরে', 'আলসে গতর' প্রভৃতি নামে সম্বোধন করতেন। দাদু কিন্তু নিদ্রাসুখে অটল। হাজার বকুনি খেয়ে তিনি একটা কথাও বলতেন না। সকালের নিদ্রাসুখ ষোল আনা তিনি উপভোগ করতে ছাড়তেন না। কাজেই পিতৃদেব ও পিতামহের এই প্রাত্যহিক সকালবেলার যুদ্ধটা তাঁদের একটা উপভোগের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

বাবার সঙ্গে একত্র মেঝেতে বসে আহার করা নিত্য নিয়ম ছিল। তাঁদের বাড়িতে ভাত খাবার ঘর বা জায়গা ছোটোখাটো ছিল না; তাতে বিশ পঁচিশজন নির্বিবাদে চারদিকে বসে খেতে পারত। বাবা পূর্বদিকে পশ্চিমমুখো হয়ে বসতেন আর অন্যান্য সবাইকে উত্তর দক্ষিণ-পশ্চিম মুখোমুখি হয়ে বসতে হতো। খেতে বসে কত যে সব গুরুগম্ভীর কথাবার্তা ও আলোচনা সমালোচনা হতো তার শেষ ছিল না। এই সভাতে রবিনাথ বরুয়া একজন সর্ববাদীসম্মত সংবাদদাতা ও সুবক্তা ছিলেন। বাবার অনুপস্থিতিতে সারাটা দিন ঘরে বাইরে যেসব কার্যকলাপ হতো তার সংক্ষিপ্ত বা বিশদ বিবরণ তাঁর ইচ্ছেমতো তিনি সেই সভায় বাবার সামনে পেশ করতেন। বাবা কাছারি গেলে তাঁরা সারাটা দিন ঘুরে বেড়িয়ে হেসে খেলে ছোটাছুটি করে দুষ্টুমি করে বেড়াতেন। দাদু এই দুষ্টুমিতে ক্ষুব্ধ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেতেন, দাঁড়াও আজ মহাশয়কে বলে তোমাদের মজা দেখাব। অনেক সময় দুপুরে খাওয়ার পর দাদু যখন বিশ্রাম করতেন, তখম তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বা ঘামাচি মেরে এইভাবে সেবার সুখ দিয়ে তাকে শান্ত করে সম্মুখ বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতেন। কিন্তু এক একদিন শত ঘুষ দিয়েও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাননি। সেই খাবার সভাতে তাঁদের দোষত্রুটির কথা বাবাকে নালিশ করার আগে দাদুর গায়ে কতকগুলো লক্ষণ প্রকটিত হয়ে উঠত। দাদুর মাথাটা কামানো হলেও মাঝখানটায় কিছু চুল ছিল। তার লম্বা চুলের টিকির গেরোটা সর্বদাই ঘাড়ের উপর পড়ে থাকত। দাদু যখন রেগে উগ্রমূর্তি ধারণ করতেন, তখন সকল সৌন্দর্য বিসর্জন দিয়ে তিনি ঘাড়ের কাছে পড়ে থাকা টিকিটা হাত দিয়ে উপরে উঠিয়ে ব্রহ্মতালুতে রাখতেন এবং তাদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে অঙ্গভঙ্গি করতে থাকতেন। যাইহোক এত সব কাণ্ড কারখানা হলেও দাদুকে কিন্তু তাঁরা প্রাণভরে ভালবাসতেন। কারণ দাদু তাঁদের দাদু, দাদু তাঁদের খেলার সহচর, গল্পের থলে। দাদুর অন্তর ছিল বড়ই কোমল। তাঁদের দুষ্টামির কথা বাবাকে নালিশ করে যদিও তাঁদের প্রহার খাওয়ানোর মূলে ছিলেন তিনি, বাবা তাঁদের একবার কি দুবার পেটাতে আরম্ভ করলেই তাঁদের গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই প্রহারের হাত থেকে উদ্ধারও করতেন তিনি। এই মহৎ গুণটি দাদুর ছিল।

তেজপুর থেকে বদলি হয়ে দীননাথ বেজবরুয়া যখন লখিমপুর এসেছিলেন তখন তাঁর ছেলেমেয়েরাও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা কার বাড়িতে উঠেছিলেন, সেটা লক্ষ্মীনাথের মনে নেই, কিন্তু দশ বারো দিনের মধ্যেই তাঁদের নতুন বাড়িটা সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের বাড়ির কাছেই সিদ্ধেশ্বর নামে একজন স্বর্ণকার ছিলেন। তিনি সোনারূপার অলঙ্কার গড়তেন আর সবাই তাকে সিধাই কর্মকার বলে ডাকত। সুযোগ পেলেই তাঁরা তাঁর কারখানায় গিয়ে একান্তমনে লক্ষ করতেন তিনি কেমন করে সোনারূপা গলানো মাটির পাত্রে ছাগলের চামড়ার হাপর দিয়ে হাওয়া দিতেন। সিধাই স্বর্ণকার কানের দুল ও হাতের বালাতে লাল, নীল আর কলাপাতা রঙের কাঁচের নকলী পাথর ভেঙে, তার এক এক টুকুরো আসল পাথরের সঙ্গে মিলিয়ে বসিয়ে দিতেন, স্বর্ণকারের বিচিত্র কাজ দেখেশুনে তাঁদের এত ভাল লাগত যে অনেক সময় উৎসাহের চোটে হাপর হাওয়া দিয়ে তাঁরা স্বর্ণকারকে সাহায্য করতেন। একবার বাবা এঁকে দিয়েই মায়ের জন্য বারোশো টাকা মূল্যের একজোড়া সুন্দর পাথর বসানো বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন তার কারখানায় সেই বালা গড়ার প্রথম দিন অর্থাৎ বোধনের দিন থেকে বিসর্জন অবধি তার সম্পূর্ণ অবস্থা লক্ষ্মীনাথের আগ্রহ আর নিরীক্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

দুর্গেশ্বর শর্মা নামে তাঁদের এক প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে লক্ষ্মীনাথরা খুবই যাতায়ত করতেন, বিশেষ করে, দুর্গোৎসবের মাসখানেক আগে থেকে যাতায়ত বেড়ে যেত। দুর্গেশ্বর শর্মা মূর্তি তৈরি করতে পারতেন। প্রতিমা গড়ার সময় শর্মাদেবের প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি কাজ তিনি লক্ষ করতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। শর্মাদেব যখন প্রতিমা গড়তেন তখন তাঁর টুকিটাকি কাজে সাহায্য করতেন বলে তিনি মাটি দিয়ে লক্ষ্মীনাথকে একটি বাঁশি তৈরি করে দিলেন। বাঁশির ফুটোতে মুখ লাগিয়ে কীভাবে বাজাতে হয় তার কৌশলটাও তিনি শিখিয়ে দিলেন। দু-চারবার ব্যর্থ চেষ্টার পর যখন তিনি ফুঁ দিয়ে আর আঙুল চালিয়ে সত্যি বাঁশিতে সুর তুললেন, তখন তার মৃদু কম্পনধ্বনি চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। কিন্তু বাঁশির দৌরাত্ম্য বাড়তে লাগল দেখে একদিন রবিনাথ দাদা হঠাৎ বাঁশিটা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিলেন এবং নিষ্ঠুরভাবে সেটা শিলের উপর আছড়ে ফেললেন। রবিনাথদার এমল নিষ্ঠুর আচরণে তাঁর দুচোখ বেয়ে জল পড়ল এবং তিনি দুঃখে শোকে ভেঙে পড়লেন। মন খারাপ নিয়ে আবার দুর্গেশ্বর শর্মার কাছে গেলেন। সব কিছু জানার পর তিনি অরেকটা বাঁশি তৈরি করে দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বাঁশির আয়ুও বেশিদিন টিকল না। কংসাবতাররূপ দাদু খবর পেয়ে পুনর্জন্ম লাভ করা এই বাঁশিটিকে আগের মতোই আছড়ে ফেললেন শিলের উপর এবং বাঁশির সৃষ্টিকর্তা দুর্গেশ্বর শর্মাকে বিশেষভাবে বলে দিলেন যেন তিনি আর কখনো লক্ষ্মীনাথকে বাঁশি তৈরি করে না দেন। এরপর তিনি তাঁদের বাড়ির চাকরকে দিয়ে একটা বাঁশি গড়িয়ে নিলেন। এই বাঁশির বকুনি দিয়ে দাদু বলেন যে, ভবিষ্যতে সে যেন আর এমন কাজ না করে। এরপর উপায় না পেয়ে নিজেই দুর্গেশ্বর শর্মার বাড়ি থেকে মাটি এনে বাঁশি তৈরি করতে লেগে গেলেন। প্রথমবার চেষ্টা করে পারেননি, দ্বিতীয়বার মাঝামাঝি, তৃতীয়বারের চেষ্টায় কাজ চলে

যাওয়ার মতো একটা বাঁশি তৈরি করতে পেরে তাঁর মন আনন্দে ভরে গেল। একদিন দুপুরবেলা ভাত খেয়ে উঠে দাদু বিছানায় পড়ে ঘুমবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় বাঁশির সুরের রাম নাম তাঁর কানে পড়ল। তিনি রেগে উত্তেজিত হয়ে দৌড়ে তাঁর দিকে তেড়ে এলেন, তিনি দিলেন দৌড়। ধরতে না পেরে তিনি দূর থেকেই শাসন করে বললেন দাঁড়াও আজ মহাশয় কাছারিবাড়ি থেকে ফিরে আসুন, তোমায় দেখাচ্ছি মজা। এই শাসনবাণী শুনে তাঁর মন দমে গেল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে তাঁর হাতে বুকের মানিক হেন বাঁশিটি সমর্পন করে, মিনতির সুরে বলেন — "দাদা প্রসন্ন হও। নাও তুমি এটা, একে শিলে আছড়ে ফেল, নয়তো ভেঙে চুরমার করে দাও। নয়তো যা মন চায় তাই করো, আমি আর বাঁশি বাজাব না।"

শৈশবস্মৃতি রোমন্থন প্রসঙ্গে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁদের বাড়িতে 'ভাদর তিনি কীর্তন'-এর কথা বলেছেন। ভাদ্র মাসে শ্রীশঙ্করদেব, মাধবদেব ও বদুলা আতার তিনি — এই তিন তিথিকে বলা হয় 'ভাদর তিনি কীর্তন'। তাঁদের বাড়িতে এই তিন দিন মহাসমারোহে কীর্তন হতো। তিথির দশবারো দিন আগে থেকেই তাঁদের উৎসাহের সে কি চোট! তিথির প্রথম দিন থেকেই শরাইতে নাম প্রসঙ্গে কলা দেওয়ার জন্য তাঁরা চারদিকের কলাবাগান খুঁজে বেড়াতেন। আর থোকা থোকা কাঁচাকলা কেটে এনে পাকতে দেওয়ার জন্য রেখে দিতেন। ছোলামুগের শরাই থেকে শুরু করে আট দশখানা থালা কীরকমভাবে মাস কলাই, চাল, কলা, ধান ইত্যাদি দিয়ে সাজালে উপচে পড়বে সেটাই তাঁদের খুব ভাবনার বিষয়ে হয়ে পড়ত। বাড়িতে তিন-চার জোড়া খোল করতাল থাকা সত্ত্বেও তাঁরা গণকপটির থেকে আরো পাঁচ ছয় জোড়া চেয়ে এনে বাজিয়ে নামপ্রসঙ্গের ধ্বনিতে মুখরিত করে তুলতেন সারা শহর। তিথির দিন নামপ্রসঙ্গদি চলতে থাকত একটানা। পরের দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিন যাত্রা-ঘোষা এবং তারপরে 'চরিত্র-তোলা' সম্পূর্ণ হলে তিথি উৎসবের সমাপ্তি ঘটত। চরিত্র-তোলা মানে শ্রীশঙ্করদেবের তিথিতে শ্রীশঙ্করদেব, শ্রীমাধবদেব আর বদুলা আতার তিথিতে মাধবদেব আর বদুলা আতার আবির্ভাবের থেকে তিরোভাব পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হতো। তিথির সময় তাঁদের বাড়িতে এই 'চরিত্র-তোলা' কাজ পিতৃদেব করতেন আর তাঁরা খুব ভক্তি সহকারে মন দিয়ে শুনতেন।

১.৬ প্রবাসে লক্ষ্মীনাথ

লক্ষ্মীনাথের প্রবাস-জীবন আলোচনার ক্ষেত্রে মূলত দুইটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে তাঁর সাহিত্য সাধনা ও সাহিত্য সৃষ্টি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। লক্ষ্মীনাথ প্রথমবার পড়াশুনার জন্য কলকাতায় এলেও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি বেশিদিন সেখানে থাকতে পারেননি। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেন। দ্বিতীয়বার বাবার অনুমতি নিয়ে পড়াশুনার জন্য আবার চলে এলেন কলকাতায়। এবার কলকাতায় এসে তিনি উঠলেন একটা ছাত্রদের মেসে। মেসটা ছিল ৫৩ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে। ছাত্রাবস্থা থেকেই লক্ষ্মীনাথের সাহিত্য চর্চা শুরু

হয়। এখানে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে হরিবিলাস আগরওয়ালার সুযোগ্য পুত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার। চন্দ্রকুমার তখন বোধহয় প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে এফ.এ. পড়তেন। কলকাতার বড়বাজারে ১০ নম্বর আর্সেনিয়ান স্ট্রীটে তাঁদের ব্যবসায়ের নিজেদের কুঠি ছিল। চন্দ্রকুমার সেখান থেকে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজের তত্ত্বধান করতেন আর কলেজে পড়তেন। প্রথম যেদিন তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের আলাপ হয়, তখন থেকেই তাঁর মিষ্টিমুখ ও মিষ্টি কথাবার্তা মনকে জয় করে ফেলেছিল। অচিরেই দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব জমে উঠল। দুজনেরই সাহিত্যচর্চার দিকে ঝোঁক ছিল। 'জোনাকী' নাম দিয়ে একখানা মাসিক পত্রিকা বের করার সংকল্প তিনি লক্ষ্মীনাথের সঙ্গে করলেন। লক্ষ্মীও তাঁকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন এবং 'জোনাকী'-র জন্য প্রবন্ধ লিখতে চাইলেন। ১৮১০ শকের মাঘ মাসে 'জোনাকী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। সেই সংখ্যা থেকেই বছরখানেক ধরে একটানা তাঁর 'লিটিকাই' শীর্ষক প্রবন্ধ তাতে প্রকাশিত হতে লাগল। চন্দ্রকুমার ছিলেন এই পত্রিকার একাধারে সম্পাদক, কার্যাধ্যক্ষ এবং স্বত্বাধিকারী। তাঁর লিখিত 'আত্মকথা' জোনাকীর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'আত্মকথা'-তে তিনি লিখেছিলেন— "আসামে পত্রিকাগুলির অবস্থা কচুপাতায় জলের ফোঁটার মতো। মানুষের চেষ্টার বিরতি নেই বলেই আমাদের এই সাহস। কাজ করাই জীবনের উদ্দেশ্য, ফলাফল পরের কথা। কাজের চাকার তলায় কত লোক মরে, কত বাঁচে, এই বাঁচা মরার সংগ্রামেই জীবনের উদ্দেশ্য রচিত। হয়তো অনেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করবে, 'আমাদের উদ্দেশ্য কি?'— কিন্তু আমাদের কাজটা না বোঝার মতো কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। রাজনীতি আমাদের 'রাজ্যের বাইরে, এই পরাধীন দেশে 'প্রজানীতি'ই করতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ ইত্যাদি আমাদের আলোচনার বিষয় — এইগুলো যথাসাধ্য বুঝে নিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব। 'বাদ' 'প্রতিবাদ' আমরা আমাদের পত্রিকায় নিশ্চয়ই ছাপাব। তা বলে ব্যক্তিগত নিন্দাকে আমরা সমর্থন করব না। ভাষার দিক থেকে আসামের বিশেষ নজর থাকবে। আসামের সব শ্রেণীর লোকের কাছে যেন এই পত্রিকাখানি সমাদৃত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখব আমরা।"

আগেই বলা হয়েছে যে প্রথম বছর 'জোনাকী'-র প্রতি সংখ্যাতে 'লিটিকাই' নামে ফিচার কলম বের হতো। লক্ষ্মীনাথ তখন নতুন লেখক এবং তাঁর অবস্থা তখন নতুন বৌয়ের মতোই, কে কী বলবে না বলবে তাই ভেবে তাঁর অবস্থা তখন তটস্থ। কেউ 'জোনাকী'তে প্রকাশিত 'লিটিকাই'র কথা শুরু করলে তিনি তক্ষুনি সেখান থেকে সুর্ সুর্ করে উঠে পড়তেন, অথচ তার শোনারও খুব ইচ্ছে থাকত। 'লিটিকাই' কবিতা নয়; রচয়িতা কবি যশপ্রার্থীও নন, তথাপি কলকাতায় ইডেন গার্ডেনের গাছের তলায় বসে 'লিটিকাই' রচনা করার কি কারণ ছিল তা জানা যায় না। শনি রবিবার তিনি ইডেন গার্ডেনে গিয়ে নির্জনে বসে 'লিটিকাই' প্রবন্ধের এক একটা অধ্যায় রচনা করতেন। প্রথমে বালির কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে লিখে নিতেন তারপরে ভালো কাগজের উপর কোনোমতে লিখে বন্ধুবৎসল আগর-ওয়ালার হাতে চুলি চুপি গুজে দিয়ে আসতেন। তিনিও তা নিয়ে ছাপিয়ে দিতেন 'জোনাকী'তে।

প্রথম সংখ্যা 'জোনাকী'তে আগরওয়ালার 'বনকুঁয়রী' কবিতাটি বের হয়। 'জোনাকী'র দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামীর 'কাকো আরু হিয়া নিবিলাও' অর্থাৎ 'কাউকে আর হৃদয় দেব না' নামে প্রেমের কবিতা বের হল। ঘনশ্যাম বরুয়ার (রায়বাহাদুর' গদ্য-প্রবন্ধ 'আত্মশিক্ষা', 'চিন্তানল', শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের 'পাহরণি' কবিতা আর সম্পাদক আগরওয়ালার 'নীয়র' কবিতা সেই বছর 'জোনাকী'র শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। 'জোনাকী'র দ্বিতীয় বছরে তার কার্যালয় ১০ নং আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে থেকে ২ নং ভবানীচরণ দত্ত লেনের মেসে উঠিয়ে নিয়ে আসা হল। চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, হেমচন্দ্র গোস্বামী আর লক্ষ্মীনাথ এই তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু এক জায়গায় এসে জড়ো হলেন আর তিনজনে 'জোনাকী'র উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। রত্নেশ্বর মহন্তের 'অসমত মান', লম্বোদর বরার 'অসমীয়া ভাষার আখর-জোঁটনি', রায়বাহাদুর গুণাভিরাম বরুয়ার 'সৌমার ভ্রমণ', বিষ্ণুপ্রসাদ আগরওয়ালার 'শঙ্করদেব' বুকে নিয়ে 'জোনাকী' জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হল। লক্ষ্মীনাথের 'কৃপাবর বরবরুয়ার কাকতর টোপোলা' শীর্ষক রচনা দ্বিতীয় বছর 'জেনাকী'তে আরম্ভ হয়। এই ধরনের চেষ্টাতে 'জোনাকী' এক বছরের মধ্যে অসমিয়ার শক্তি বৃদ্ধি করে অসমিয়া সাহিত্য গগনে সকালের সূর্যের কিরণ বিতরণ করল। তৃতীয় বছর 'জোনাকী'র সম্পাদনার ভার পড়েছিল লক্ষ্মীনাথের উপর। লম্বোদর বরা, আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা (রায়বাহাদুর), রত্নেশ্বর মহন্ত, শ্রীযুক্ত কনকলাল বরুয়া (রায়বাহাদুর), লক্ষেশ্বর শর্মা, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বরদলৈ, পাণীন্দ্রনাথ গগৈ ইত্যাদির প্রবন্ধে 'জোনাকী' সমৃদ্ধ হয়েছিল। সেই বছরই প্রকাশিত হয়েছিল রত্নেশ্বর মহন্তর 'মোরামরীয়া বিদ্রোহ' নামের মূল্যবান প্রবন্ধ। লক্ষ্মীনাথের 'পদুম কুয়রী' উপন্যাসও সেই বছর প্রকাশিত হয়। চতুর্থ বছরও 'জোনাকী'-র সম্পাদক তিনি ছিলেন. এরপর 'জোনাকী' ১৮ নং আর্মহাস্ট স্ট্রীটের মেসবাসী কিছু অসমিয়া ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল। 'জোনাকী'র আকারেরও কিছুটা পরিবর্তন হয়। শ্রদ্ধাস্পদ সুলেখক শ্রীসত্যনাথ বরার সম্পদনায়ও 'জোনাকী' প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সম্পাদনায় তিন বছর প্রকাশিত হবার পর 'জোনাকী' বন্ধ হয়ে যায়। বলাবাহুল্য যে বরা মহাশয়ের বিচক্ষণ সম্পাদনায় 'জোনাকী'তে লক্ষ্মীনাথের 'আজি', 'চেনি চম্পা', 'কোকো ককা', 'জয়ন্তী', 'পুত্রবান পিতা' নামের ছোটগল্প প্রকাশিত হয়।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তখন জেনারেল এসেমব্লি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণির ছাত্র। 'পলগ্রেভস গোল্ডেন ট্রেজারি অব লিরিক্স্' নামে ইংরেজি কবিতার সংগ্রহ ছিল তাঁদের পাঠ্য। তাছাড়া বায়রন, শেলী, কীটসের কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো আছেই। কবিতার বর্ষণ ধারায় তাঁর মন 'প্রেম রসে' সিক্ত। তাঁর মনের দিগন্ত মাঠে বায়রনের কবিতা যেন পালি দিয়ে নরম করেছিল মাটিকে, শেলীর কবিতা তার উপর লাঙল চষে দেয়, কীটসের কবিতা দেয় মই আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা সেই জমিতে ফসলগুলোকে তর্‌তর্ করে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এক কথায় বলা যায় — তার মনের অবস্থা তখন রঙ্গীন। প্রেম ও ভালবাসা তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে দিল তাঁর মন। মনটা উড়ে কোনে অজানা দেশে ঘুরে বেড়িয়ে প্রেমের সুমধুর সুরে বীণা বাজিয়ে নিজেকে

করেছে পাগল আর করেছে জগৎকে। তখন তিনি বাড়ির তিন তলার ছাদের উপর গিয়ে নিস্তব্ধ রাত্রিতে পূর্ণিমার চাঁদের দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে থেকে ঘুমই ভুলে গেলেন। ফুল একটা কুড়িয়ে পেলে তার রঙ দেখেই আনন্দে তিনি বিভোর হয়ে থাকেন। তাঁর হাবভাব দেখে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন —

"আমি স্বপনে রয়েছি ভোর

সখি, আমারে মোরে জাগায়ো না।"

তাঁর অস্থির মনটা এক রকমভাবে যখন উথাল-পাথাল করছিল, তখন তিনি একদিন পড়লেন প্রেমে — না বললেও হবে যে একজন সুন্দরীর। ভাবলেন, এই জিনিসটাকেই তিনি খুঁজে বেড়িয়েছিলেন এতদিন ধরে। — তখন কবির গান তাঁর মুখে দিয়ে বেরোল—

"আমার পরাণ যাহা চায়

তুমি তাই, তুমি তাই গো।

তোমা ছাড়া আর এ জগতে

মোর, কেহ নাই কিছু নাইগো।"

তাঁর হৃদয়ে ভাবের জোয়ার এল। রূপসীর সামনে নিবেদন করলেন; কিন্তু রূপসী নীরব। যাইহোক নির্বাক কন্যার উদ্দেশে তখন ইংরেজি, বাংলা, অসমিয়া এই তিন ভাষায় কবিতা রচনা করে ক্লাসের নোটবুকটা ভরে ফেললেন। তেতলার ছাদে একলা একলা বসেই ইংরেজি গান করতেন —

"Her hands are white as snow

O white as snow!

O Brignal banks are wild and fair

Greta woods are queen!"

একদিন যখন গাইছিলেন 'Her hands are white as snow', তখন পিছন থেকে এসে একজন জিজ্ঞাসা করল, কি বরুয়া মশায়, কার হাত বরফের মতো সাদা? তিনি চম্‌কে উঠে লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন। কিন্তু তক্ষুনি নিজেকে সামলে নিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্যকথা পাড়লেন।

এরপরে মনে করলেন তাঁর অমূল্য কবিতাগুলো মাসিক পত্রিকার পাতায় ছাপালে কেমন হয়? ইংরেজি কবিতাগুলো কোথায় ছাপাবেন ঠিক করতে পারলেন না। অসমিয়া কবিতাগুলো ঠিক করলেন, 'জোনাকী'-তে পাঠাবেন। তাঁর বন্ধুরা তাঁর এই কবিতা রোগের খবর পেয়ে তাঁকে ঠাট্টা তামাশা করবে এই কথা ভেবে তা থেকে নিরস্ত হলেন। তবে বাংলা কবিতাগুলো ছদ্মনামে ছাপাবেন বলে ঠিক করলেন। দুটি পত্রিকায় দুটি প্রেমের কবিতা পাঠালেন। ছদ্মনাম নিলেন 'শ্রীরঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায়'। একমাস পরে হল, দুমাস

পার হল, তবুও তাঁর কবিতার দেখা নেই সেই পত্রিকা দুটিতে। তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। সামনের মাসে বের হবে এই আশায় দিন কাটাতে লাগলেন কিন্তু পরের মাসেও বেরোল না। শেষকালে থামতে না পেরে সম্পাদক দুজনকে চিঠি দিলেন, তাঁর কবিতা পেয়েছেন কিনা এবং তা ছাপা হবে কিনা। যদি না হয় তাহলে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিন, কেন না তিনি তার নকল রাখেননি। আবার 'পুঃ' বলে লিখে দিলেন যে তিনি তাঁদের কাগজের গ্রাহক এবং হিতাকাঙ্ক্ষী।

একজন সম্পাদক ছিলেন নিশ্চয় বেরসিক। তিনি উত্তর পাঠালেন, 'আপনার কবিতাটি ছাপাইবার অযোগ্য। ফেরত পাঠাইলাম'। অন্যজন যে রসিক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি লিখে পাঠালেন — "আপনার কবিতাটি আমার ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে যত্নপূর্বক রেখে দিয়েছিলাম। সেখান থেকে তুলে নিয়ে আপনার কাছে পাঠাতে কষ্ট হল। পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আপনি নিশ্চয় স্কুল কি কলেজের ছাত্র। কবিতা লিখিবার বৃথা প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া পাঠ্য পুস্তকে মনোযোগ দিলে বাধিত হইব।" এই উত্তর পেয়ে তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। রসিক সম্পাদককে যা তা গালাগালি দিয়ে চিঠি দিলেন। চিঠির মর্ম হল এই যে তিনি কাগজের সম্পাদক হওয়ার উপযুক্ত নন। কারণ তিনি বোঝেন না প্রকৃত কবিতা কাকে বলে। তাঁর পত্রিকাখানিতে যত রাজ্যের অপদার্থ প্রবন্ধের সমাবেশ। কারণ প্রকৃত কবিতার মানে বোঝেন না তিনি। তাঁর পত্রিকার পাতা দিয়ে তিনি জুতোর ধুলো মোছেন ইত্যাদি। সম্পাদক মহাশয় তাঁর চিঠির কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবলেন, সম্পাদক বেশ জব্দ হয়েছেন। চিঠি পেয়ে সম্পাদকের কী হল বলতে পারেননি, কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি এত দমে গেলেন যে বলা যায় না।

'বাঁহী' পত্রিকায় লক্ষ্মীনাথের 'আমার জীবনস্মৃতি' (মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেই ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকার দ্বাদশ বছরের (১৮৪৪ শক) আশ্বিন মাসের ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে লিখতে আরম্ভ করেন এবং চতুর্দশ বছরের (১৮৪৬ শক) আষাঢ় মাসের তৃতীয় সংখ্যাতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর লিখবেন না ভেবে তিনি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধে পুনরায় লিখতে বাধ্য হলেন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের সম্পর্ক স্থাপন হয় বৈবাহিক সূত্রে। সেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে যিনি মধ্যমণি হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত। বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের পরিচয় হয় হরিবিলাস আগরওয়ালার (চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার পিতা) বাড়িতে। বৈকুণ্ঠবাবুই ঠাকুরবাড়িতে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। যে কন্যাটির সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের বিয়ের কথা হল তাঁর একটি 'ফোটোগ্রাফ' লক্ষ্মীনাথের হস্তগত হয়। তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও গুণের কথা তিনি অনেক শুনেছিলেন। ঈশ্বরই জানেন, তাঁর মন কেন তাঁকে জীবনের সহচরী ও সহধর্মিনী হিসেবে গ্রহণ করল। তাঁর সেই ছবিটাও বালিশের তলায় রেখে দিতেন। আজকালকার শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা শুনে আশ্চর্য হবেন

যে তখন বিয়ের আগের মুহূর্তে পর্যন্ত তাঁদের কোনো দেখা সাক্ষাৎ হয়নি বা পরস্পরে পরস্পরের প্রতি চিত্তাকর্ষণের জন্য মায়ার খেলার অভিনয় করতেও হয়নি; কারণ তাদের দুজনের এই ধরনের জিনিসের উপর কোনো আগ্রহ ছিল না; আগ্রহ থাকলে তাতে কোনো বাধা থাকত না। কারণ, সেই পরিবারে মর্যদা, সম্মান ও শালীনতা বজায় রেখে এরকম দেখা সাক্ষাতে আপত্তি ছিল না। ছবিতে তিনি তাঁকে দেখলেন সুন্দরী সুশীলা এবং বিশেষ করে তিনি ধর্মপ্রবণা বলে শুনেছেন — সেটাই তাঁর কাছে যথেষ্ট।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের বিয়ে হয়। সেইসময় তিনি নিজ বাড়ি জোড়াসাঁকোতে না থেকে পার্কস্ট্রীটে একটা প্রকাণ্ড বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। বিয়ের পর তাঁর দুজনে মহর্ষির কাছে আশীর্বাদ চাইতে গেলেন। তিনি আশীর্বাদ করে তাঁকে একটা সোনার কলম দিলেন এবং বললেন, "তোমার এই কলম দিয়ে সুনিপুণ লেখা বেরুবে।" নাতনীর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে হাতে সুন্দর গোলাপ একগুচ্ছ দিয়ে বললেন, "তোমার যশ সৌরভ এই ফুলের সৌরভের মতো চতুর্দিকে বিস্তার হবে।"

অনেক দিনের পরে সেই বড়ো পরিবারে এই ধরনের বিয়ের ঘটনা সারা পরিবারের শিক্ষিত মার্জিত যুবকদের মনে অনেক দিন ধরে জেগেছিল। তাঁদের ভিতরে নতুন নতুন কাজের প্রতি উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। তার দু-চারটের কথা উল্লেখ করা হল। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মায়ার খেলা' নামক নাটক হয়েছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলার বাড়িতে। কবিবর তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গে সেই নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মেয়েদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিদুষী গ্র্যাজুয়েট কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, 'ভারতী'র সম্পাদিকা মহর্ষিকন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্র্যাজুয়েট কন্যা শ্রীমতী সরলা ঘোষাল এবং ঠাকুর পরিবারের অন্যান্য মেয়েরাও ছিল। প্রজ্ঞাসুন্দরী তখন বিবাহিতা বলে লক্ষ্মীনাথের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, তিনি আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিয়েছিলেন। অভিজাত শ্রেণির দর্শকের দ্বারা সভা পরিপূর্ণ হয়ে যেত। অভিনয় দেখে এবং আহারাদি সমাপন করে পরম তৃপ্তি লাভ করে সবাই বাড়ি ফিরতেন।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরা মিলে 'সুহৃদয় সমিতি' নাম দিয়ে একটা সমিতি করলেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। পরিবারের সকলেই বলতে গেলে সেই সমিতির সভ্য ছিলেন। বাইরের দু-চারজন শিক্ষিত বন্ধুকেও সেই সমিতির সভ্য করা হয়েছিল। সভার উদ্দেশ্য — সভ্যদের মধ্যে প্রীতি বাড়ানো। উপায় — সাহিত্যচর্চা এবং মধুর প্রীতিভোজন। সমিতির অনেকগুলো অধিবেশন হয়েছিল। সেখানে সভ্যদের দ্বারা রচিত ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় রচনা পাঠ করা হতো এবং তার সমালোচনাও করা হতো। এর থেকেই বাংলা মাসিক পত্রিকা 'সাধনা'-র জন্ম। তার সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করা হল সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। কিছুদিন পর সুধীন্দ্রনাথের স্থান নিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করল 'সাধনা'। কিছুদিন পর 'সাধনা' বন্ধ হয়ে যায়। সমসাময়িক না হলেও আগে পরে সেই পরিবার থেকে আরও একটি মাসিক পত্রিকার

জন্ম হয়েছিল। তার মূলে ছিলেন হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদিকা ছিলেন লক্ষ্মীনাথের সহধর্মিনী শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। বছর খানেক বাদে সেই কাগজখানিও লুপ্ত হল।

১.৭ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই প্রথম বিভাগে আমরা সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জীবনী ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেছি। জীবনী ও আত্মজীবনীর সংজ্ঞা ও উভয়ের পার্থক্য আলোচনা করেছি। এছাড়া তুলে ধরেছি লেখকের জীবন ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তারপর লক্ষ্মীনাথের শিক্ষা-জীবন, শৈশব-স্মৃতি ও প্রভাসে লক্ষ্মীনাথের জীবন নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

১.৮ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা : চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার জন্ম হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে শোণিতপুর জেলার কলংপুর মৌজার ব্রহ্মজান গ্রামে। তাঁর পিতার নাম হরিবিলাস আগরওয়ালা। চন্দ্রকুমার ছিলেন 'জোনাকী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক। 'জোনাকী' পত্রিকায় প্রকাশিত চন্দ্রকুমারের 'বনকুঁয়রী' নামক কবিতার মাধ্যমেই অসমিয়া রোমান্টিক কবিতার শুভারম্ভ হয়। তাঁর দুটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল — 'প্রতিমা' এবং 'বীণবরাগী'। ১৯৩৮ সালে চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার দেহাবসান ঘটে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : ১৮১৭ সালের মে মাসে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা। তিনি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিরূপে খ্যাত। 'ব্রাহ্মধর্ম', 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান', 'পরলোক ও মুক্তি' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে রামমোহন রায়ের ধর্মমতে দীক্ষিত হন। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মানুভূতি ও চিন্তার অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রদানের পাশাপাশি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ধর্মান্দোলনেরও পরিচয় তুলে ধরেছে। ১৯০৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

ভাদর তিনি কীর্তন : ভাদ্র মাসে শ্রীশঙ্করদেব, মাধবদেব ও বদুলা আতার তিথি। এই তিনি তিথিকে 'ভাদর তিনি কীর্তন' বলে।

হাতি খুজীয়া বাটি : হাতিখুজীয়া বাটি হচ্ছে হাতির পদচিহ্ন আঁকা চওড়া এক প্রকারের বাটি।

বোকা চাউল : এক প্রকার চাল, চিড়ের মতে ভিজিয়ে দিলে ফুলে ভাত হয়ে যায়। যেমন সুন্দর গন্ধ, তেমন সুন্দর খেতে।

ভারতী : জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে এর জন্ম। জন্মলগ্নে এর সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিশোর রবীন্দ্রনাথ 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের যে বিরূপ সমালোচনা লেখেন তাও ছ-মাস ধরে পর্যায়ক্রমে 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির অস্থায়ী সম্পাদনার পর ১৩০৯ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। এর পর কাজের চাপে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। তাঁর ভগ্নি সরলা দেবী সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

সাধনা : নতুন সাহিত্যচিন্তার প্রকাশের জন্য ১৮৯১ সালে 'সাধনা' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সাধনা' চারবছর চলে। শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক ছিলেন। এতে লিখতেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সখারাম দেউস্কর প্রমুখেরা। অক্ষয়কুমার মৈত্রের হাতেখড়ি এই পত্রিকায়।

স্বর্ণকুমারী দেবী : উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ১৮৫৫ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর বিখ্যাত 'স্নেহলতা' উপন্যাসে শিক্ষিত সমাজে আধুনিকতার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর অপর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দীপনির্বাণ', 'ছিন্নমূল' উল্লেখযোগ্য। ১৯৩২ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রয়াণ ঘটে।

১.৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। জীবনী ও আত্মজীবনীর পার্থক্য নির্দেশ করে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনী গ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

২। লক্ষ্মীনাথ তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে যেসব কাহিনির কথা বলেছেন, সে বিষয়ে আপনার নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

৩। লক্ষ্মীনাথের শিক্ষা-জীবন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। রবিনাথ মাজুদলর বরুয়া কে? শৈশব স্মৃতি আলোচনা করতে গিয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন তা আলোচনা করুন।

৫। 'আমার জীবন স্মৃতি'-তে প্রকৃতির যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা উল্লেখ করুন।

৬। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার প্রবাস-জীবন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। লক্ষ্মীনাথের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত কোন পত্রিকাকে অবলম্বন করে হয়েছিল? পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীনাথ কী কী সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন?

৮। 'জোনাকী' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ কাল উল্লেখ করে এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের সাহিত্য সম্ভারের পরিচয় দিন।

৯। জোড়াসাকোঁ ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জীবনে কতটুকু প্রভাব ফেলেছিল, সে বিষয়ে আপনার নিজের ভাষায় লিখুন।

১.১০ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-২

আমার জীবনস্মৃতি

আমার জীবনস্মৃতি : প্রাসঙ্গিক আলোচনা —২

বিষয় বিন্যাস

২.০ ভূমিকা (Introduction)

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

২.২ অসমের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লক্ষ্মীনাথের স্মৃতি

২.৩ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সমসাময়িক অসমের সমাজচিত্র

২.৪ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জীবনে শিক্ষকদের প্রভাব

২.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

২.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

২.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

২.০ ভূমিকা (Introduction)

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে অসমের বুকে এক আলোক-সন্ধানী শিশুর জন্ম হয়েছিল; সেই শিশু পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জন করে অসমে জাতীয় নেতার আসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন, তিনি হলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। আধুনিক অসমিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁকে 'রসরাজ' এবং 'সাহিত্যরথী' লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াও বলা হয়। ১৮৬৮ সালের নভেম্বর মাসে লক্ষ্মীনাথের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম দীননাথ বেজবরুয়া ও মাতা থানেশ্বরী দেবী। লক্ষ্মীনাথ ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে শিবসাগর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন। এর দুববছর পর এফ.এ. এবং ১৮৯০ সালে কলকাতার জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। ১৮৯১ সালে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বেজবরুয়ার সাহিত্যিক যোগ্যতা অনস্বীকার্য। ১৮৯০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত — এই চার দশক ধরে অসমিয়া সাহিত্যকে প্রগতির পথে চালনা করেছে লক্ষ্মীনাথের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য প্রচেষ্টা। নিজের সৃষ্টির দ্বারা তিনি অসমিয়া সাহিত্যে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিলেন। অসমিয়া সাহিত্যের বৈষ্ণব-যুগকে যদি শঙ্করদেবের যুগ বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে অসমের আধুনিক সাহিত্যের যুগ নিঃসন্দেহে বেজবরুয়া-যুগ। বেজবরুয়া ছিলেন 'জোনাকী', 'ঊষা', 'বিজুলী' আদি পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং 'বাঁহী'-র সম্পাদক। ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আজ

অসমের গর্ব ও অভিমানের মূলে রয়েছেন এই স্বদেশপ্রেমী, যাঁর সাহিত্যজীবনের অধিকতর সময় কেটেছিল প্রবাসে। অথচ তাঁরই রচিত 'ও মোর আপোনার দেশ' আজও অসম-সংগীত রূপে স্বীকৃত ও বহুমানিত।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির জামাতা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার আত্মজীবনী 'মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ' প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর নিজেরই সাহিত্যপত্র 'বাঁহী'তে। গ্রন্থকারে এর প্রকাশকাল ১৯৪৪। এর বাংলা অনুবাদ 'আমার জীবনস্মৃতি' এবং অনুবাদক হচ্ছেন আরতি ঠাকুর।

২.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

চতুর্থ ষাণ্মাসিক দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে "আমার জীবনস্মৃতি : প্রাসঙ্গিক আলোচনা—২।" এই বিভাগ থেকে আপনারা অসমের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লক্ষ্মীনাথের স্মৃতি, তাঁর জীবনে শিক্ষকদের প্রভাব এবং সমসাময়িক অসমের সমাজচিত্র সম্পর্কে অবগত হবেন।

২.২ অসমের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লক্ষ্মীনাথের স্মৃতি

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবনের অধিকাংশ সময় অসমের বিভিন্ন শহরে অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর পিতা দীননাথ বেজবরুয়া ছিলেন সরকারি মুন্সেফ। ফলে সরকারি আদেশ তাঁকে প্রায়ই বদলি (ট্রান্সফার) হয়ে শহরান্তরে যেতে হতো। এভাবে লক্ষ্মীনাথ ও তাঁর ভাইয়েরাও পিতার সঙ্গে ওই সময় শহরে স্থানান্তরিত হতেন। 'আমার জীবনস্মৃতি'তে লেখক অসমের অন্তত পাঁচটি শহরের নাম করেছেন যেখানে তিনি শৈশব-কৈশোরে তাঁর পিতার সঙ্গে সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। সেই পাঁচটি শহর ক্রমে— বরপেটা, তেজপুর, লখিমপুর, গুয়াহাটি ও শিবসাগর।

বরপেটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতি :

দীননাথ বেজবরুয়া যখন নগাঁও থেকে মুন্সেফের কাজে বদলি হয়ে বরপেটা যাচ্ছিলেন, তখনই কেনো একসময় ব্রহ্মপুত্রের চরে নৌকার মধ্যে লক্ষ্মীনাথের জন্ম। ওই সময় অসমে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকা। তাই ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে নগাঁও থেকে বরপেটা পর্যন্ত যাওয়ার পথে আঁহতগুড়ির কাছে একটি চরে খাওয়ার ব্যবস্থা করার সময় লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন লক্ষ্মীনাথের জন্ম হয়। তারপর তারা চলে যান বরপেটা। দীননাথ বেজবরুয়া প্রায় তিন বছর বরপেটায় ছিলেন মুন্সেফ হয়ে। ওই শিশু অবস্থায় দেখা বরপেটা শহর স্মৃতি হয়ে রয়ে গিয়েছিল লক্ষ্মীনাথের মনে। তাঁর উল্লেখ তিনি করেছেন 'আমার জীবনস্মৃতি'তে। তাঁর সেই কথাগুলিকে আমরা সূত্রকারে এভাবে উল্লেখ করতে পারি—

(ক) বর্ষাকালে নদীর জলে ডুবে যেত বরপেটা শহর। লক্ষ্মীনাথ স্মরণ করেছেন যে একবার এরকম জলের সময় তাঁরা যে বাড়িতে থাকতেন, সেটা জলে ডুবে যায়। তখন তারা শিশু-কিশোরেরা ওই জলে একজন আরেকজনকে তাড়া করে বেড়াতেন। কিন্তু সন্দেবেলা পিতৃদেব এসে যখন একথা শুনতে পেলেন তখন সবাইকেই তিনি কয়েক ঘা করে বেত লাগিয়ে দেন।

(খ) বর্ষাকালে যদি পিতার সঙ্গে কোথাও নৌকা করে বেড়াতে যাওয়া হতো, তখন নদীতে বুনো মোষের কালো কালো শিং আর ওদের সাঁতার কাটার দৃশ্য চোখে পড়তো।

(গ) পিতার সঙ্গে বরপেটার কীর্তনঘরে প্রায়ই যেতেন লক্ষ্মীনাথ। সেই কীর্তনঘরের মধ্যেকার বড়ো বড়ো থাম, প্রদীপ সাজাবার স্থান ও বসবার জন্য চাতাল— এই তিনটির কথা গেঁথে ছিল তাঁর মনে।

(ঘ) বরপেটায় সত্রের চাতালে সত্রাধিকারীর ঘরের ভিতরে হাতির পদচিহ্ন আঁকা চওড়া বাটিতে মোষের দুধ থেকে প্রস্তুত দৈ আর গুড় দিয়ে সুগন্ধি কোমল চাল (চাউল) সহযোগে জলপান করার বিষয়টিও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে ছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার।

তেজপুরের স্মৃতি :

বরপেটা থেকে দীননাথ বেজবরুয়া বদলি হয়ে আসেন তেজপুর শহরে। তেজপুর শহরে যখন লক্ষ্মীনাথ এসেছিলেন তখনও তিনি শিশু। ফলে শহরের থাকার স্মৃতি খুব বেশি তাঁর মনে নেই। তিনি নিজেই বলেছেন—

"তেজপুরে এসে আমরা কোথায় উঠেছিলাম, কার ঘরে ছিলাম আর কখন যে নিজেদের আলাদা বাড়িতে চলে এলাম সেসব কথা আমার কিছুই মনে নেই। কেবল মনে আছে তেজপুরের পাহাড়ের উচুঁ নিচু টিলা আর লাল মাটির রাস্তাঘাট। এইসব দেখে আমার মনে কী আনন্দই না হত।"

তেজপুরে আরও কিছু স্মৃতির কথা উল্লিখিত হয়েছে 'আমার জীবনস্মৃতি'তে। সেগুলি সূত্রকারে এভাবে বলা যেতে পারে—

(ক) লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াদের যেখানে বাড়ি ছিল, তার পাশে একটা খোলা জায়গায় ছিল সুন্দর সুগন্ধ ফুলে ভরা বন্য 'ঢেপাইতিতা'র গাছ।

(খ) পিতা দীননাথ বেজবরুয়া ছিলেন বৈষ্ণব দর্শনে বিশ্বাসী, ফলে তিনি প্রায়ই তেজপুরের নিকামূল সত্রে যেতেন। শিশু লক্ষ্মীনাথও পিতার সঙ্গে সেখানে যেতেন কখনও। সেই সত্রে যাওয়ার কথাও মনে ছিল তাঁর।

(গ) তেজপুর শহরের কুমোরদের একটা গ্রাম ছিল। ওই কুমোরেরা প্রায় সময়ই

আসত দীননাথ বেজবরুয়ার বাড়ি। ওরা যখন আসত তখন ছোটো ছোটো শিশুদের জন্য নিয়ে আসত মাটির তৈরি ঘুন্টি ও খেলনা।

(ঘ) লক্ষ্মীনাথের ছোটো ভাই লক্ষ্মণের জন্ম হয়েছিল তেজপুরে। তার জন্মের কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ির পরিচারিকা আহিনীর একটি ছেলে হয়, তার নাম টৌরাম। শিশু লক্ষ্মণকে যখন বিলাতি 'পেরাম্বুলেটর' বা শিশু ঠেলাগাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হতো। তখন তা দেখে টৌরাম ওই ঠেলাগাড়িতে ওঠার জন্য বায়না করে কান্না করত। সেটা দেখে পিতা একজন ছুতোর (কাঠমিস্ত্রি) ডেকে কাঠের তক্তার তৈরি খোলা কাঠের একটা গাড়ি ওর জন্য নির্মাণ করান। ওই গাড়িতে চড়ে টৌরাম ভীষণ খুশি হতো আর দীননাথও খুব আনন্দিত হতেন।

(ঙ) তেজপুরের স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্মৃতি হল রবিনাথ মাজুদলর বরুয়া বা রবিদাদুর স্মৃতি। তিনি লক্ষ্মীনাথদের দূর সম্পর্কের দাদু ছিলেন ও তাঁদের (অর্থাৎ শিশুদের) দেখাশুনা করতেন। সম্পর্কে দাদু হলেও তিনি লক্ষ্মীনাথের পিতার চেয়ে বয়সে ছোটো ছিলেন। তিনি শিশুদের খেলার সঙ্গী, অভিভাবক, গল্পের থলে আর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কাহিনির বটুয়া ছিলেন। লক্ষ্মীনাথদের বাড়ির ঠাকুরঘরের মূর্তি ও শালগ্রাম শিলা পুজো করার ভার ছিল তাঁর উপর। রবিদাদু সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠতে পারতেন না বলে দীননাথ বেজবরুয়া প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে বকুনি দিয়ে ঘুম থেকে ওঠাতেন। তখন তাঁকে 'ঘুম কাতুরে' 'আলসে গতর'— প্রভৃতি নামে সম্বোধন করতেন দীননাথ। কিন্তু এইসব শুনেও তিনি না শোনার ভান করে সকালের নিদ্রাসুখ ঠিক উপভোগ করতেন।

রবিদাদুর একটি প্রধান কাজ ছিল যখন সবাই একসঙ্গে খেতে বসতেন তখন সারাদিনের রিপোর্ট পিতার কাছে পেশ করা। অর্থাৎ কোন শিশু কী কী দুষ্টামি করেছে, সেটা পিতার কাছে সবিস্তারে বলা। যেদিন দাদু বেশি রেগে থাকতেন সেদিন এই অভিযোগগুলো পেশ করার সময় তাঁর শরীরে বেশ কিছু লক্ষণ ফুটে উঠত। সেই সময় তিনি— "তখন সকল সৌন্দর্য বিসর্জন দিয়ে তিনি ঘাড়ের কাছে পড়ে থাকা টিকিটা হাত দিয়ে উপরে উঠিয়ে ব্রহ্মতালুতে রাখতেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে অঙ্গ-ভঙ্গি করতে থাকতেন। এইরকম লক্ষণ আমাদের আর জানতে বাকি রাখতো না যে এখন আমাদের মহা দুর্যোগ।"

সে যাইহোক, দুষ্টামির কথা পিতাকে নালিশ করলেও পিতা যখনই প্রহার করতে শুরু করতেন, তখন এই শিশুদের সেই পেটানোর হাত থেকে রক্ষাও করতেন এই রবিদাদুই। এইজন্য শিশুরা সবসময়ই তাঁকে ভালোবাসতো।

তেজপুরের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে রবিদাদুর বিয়ে দেন দীননাথ বেজবরুয়া। দাদুর স্ত্রীও লক্ষ্মীনাথদের বাড়িতেই থাকতেন ও তাঁদের খেলার সঙ্গী হয়েছিলেন।

লখীমপুরের স্মৃতি :

তেজপুর শহর থেকে লখিমপুর শহরে যখন বদলি হয়ে এলেন দীননাথ বেজবরুয়া, তখন প্রথমদিকে তাঁরা উঠেছিলেন অন্য একজনের বাড়িতে। তবে কার বাড়িতে উঠেছিলেন তাঁরা, সেকথা লক্ষ্মীনাথ মনে করতে পারেননি তাঁর স্মৃতিকথায়। তবে দশ বারোদিনের মধ্যেই তাঁরা তাঁদের নিজস্ব বাড়িতে চলে এসেছিলেন। "নতুন বাড়িটার ঘরগুলো ছিল প্রশস্ত, দরজা জনানালা বেড়ায় একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গৃহ প্রবেশের দিন যে পুজো ও কীর্তনাদির অনুষ্ঠান করা হয়েছিল— সেইসব উৎসব-আনন্দের কথা আজও আমাদের বেশ মনে আছে।"

লখিমপুর শহরের স্মৃতির কথা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন তাঁর জীবনস্মৃতিতে। আমরা সেগুলিকে এভাবে সূত্রাকারে সাজাতে পারি—

(ক) লখিমপুরে লক্ষ্মীনাথদের বাড়ির কাছেই সিদ্ধেশ্বর নামে একজন স্বর্ণকার ছিলেন। তিনি সোনারূপার অলঙ্কার তৈরি করতেন। তাঁর অলঙ্কার তৈরির বিষয়টি ছোটো ছোটো শিশুদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। অলঙ্কার তৈরির সময় সোনারূপা গলানো মাটির পাত্রে ছাগলের চামড়ার হাপর দিয়ে হাওয়া চালিয়ে দিয়ে সোনারূপাগুলো ঠাণ্ডা জলের পাত্রে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে শক্ত করে নিয়ে তা নিহাইয়ের উপর রেখে রকমারি অলঙ্কার গড়তেন তিনি। এক একদিন বালক লক্ষ্মীনাথ মায়ের কাছ থেকে চেয়ে একটা ডবল পয়সা নিয়ে গিয়ে সিধাই স্যাকরাকে দিয়ে একটা ছোটো বাটি বানিয়ে অনেকদিন সেটাকে যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। এই কর্মকারকে দিয়ে লক্ষ্মীনাথের পিতা তাঁর স্ত্রীর (লক্ষ্মীনাথের মা) জন্য বারোশো টাকা মূল্যের একজোড়া সুন্দর পাথর বসানো বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। সিধার কর্মকারের মেয়ের নাম ছিল জয়া। সে লক্ষ্মীনাথদের সঙ্গে মাঝে মাঝে খেলা ধূলা করত।

(খ) দুর্গেশ্বর শর্মা নামের একজন কেরানি ছিলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াদের প্রতিবেশি। তিনি খুব ভালো প্রতিমা তৈরি করতে পারতেন। বিশেষ করে দুর্গাপূজার দুর্গামূতি তিনি গড়তেন নিজের হাতে। বালক লক্ষ্মীনাথদের এই মূর্তি গড়া দেখায় ছিল বিশেষ উৎসাহ। তাঁরা তাঁকে উৎসাহদের সঙ্গে খড়ের আঁটি বেঁধে কাদা মাটি ঘেটে সাহায্য করতেন। শর্মাদেব যখন সাদা, হলদে, লাল রঙ বেটে প্রতিমার গায়ে লাগাতেন তখন প্রতিমাকে ভীষণ উজ্জ্বল দেখাত। 'কোথায় এই রঙগুলো পাওয়া যায়?'— একথা জিজ্ঞেস করায় শর্মা বলতেন যে গোধুলির পশ্চিমাকাশের বিচিত্র রঙের মাঝখান থেকে ওই রঙগুলো তিনি নিয়ে এসেছেন। এই রঙ দেবীপুজোর সময় আকাশের দেবতা শুধু তাঁকেই দেন।

লক্ষ্মীনাথ প্রতিমা গড়ার কাজে দুর্গেশ্বরবাবুকে সহায়তা করতেন বলে তিনি একটা মাটির বাঁশি তৈরি করে লক্ষ্মীনাথকে খেলার জন্য দিয়েছিলেন। কয়েকবারের চেষ্টায় যখন বাঁশিতে সুর উঠল, তখন বালকের যে কী আনন্দ! দিনরাত এই বাঁশির দৌরাত্ম বেড়ে যেতেই থাকল। এই উৎপাত এ অতিষ্ঠ হয়ে রবিদাদু বাঁশিটি কেড়ে নিয়ে ভেঙে

ফেলেন। এবার লক্ষ্মীনাথ বাড়ির চাকরের সাহায্যে একটা কাজ চালানোর মতো বাঁশি তৈরি করেন, কিন্তু রবিদাদু সেটিও ভেঙে দেন এবং চাকরকে ভীষণ বকা দেন আর তৈরি করে না দেবার জন্য। এরপর লক্ষ্মীনাথ নিজের চেষ্টায় একটা বাঁশি বানান। এবার রবিদাদু রেগে গিয়ে পিতার কাছে নালিশ করার কথা বলেন। তখন বালক লক্ষ্মীনাথ নিজেই সেই বাঁশি রবিদাদুর হাতে তুলে দেন ভয় পেয়ে।

পিতৃদেব যখন লক্ষ্মীমপুরে ছিলেন সেই সময়ে কিছু দুষ্ট লোক ষড়যন্ত্র করে তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যে অভিযোগ করে; সেই অভিযোগের বিচারের জন্য তাকে ডিব্রুগড়েও যেতে হয়েছিল। পিতৃদেব যখন পথে, সেই সময়ে ডিব্রুগড়ের কাছারী ঘরটা অকস্মাৎ পুড়ে যায়। তিনি এ কাজ করেছেন বলে তার বিরুদ্ধে ডেপুটি কমিশনার কর্নেল ক্লার্কের কাছে এই অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ক্লার্ক কোনো বিবেচনা না করে 'ঘড় পোড়ানো' অভিযোগের দণ্ডবিধি আইনের ধারাতে ফেলে পিতৃদেবকে হাজোতে দিল। অবশ্য ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস, তার পৌরুষোচিত ব্যবহার এবং নির্ভিক উত্তরে কর্নেল ক্লার্ক থেকে শুরু করে শত্রুদের সকলের প্রাণে আতঙ্ক ও জনসাধারণের মনে বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দের সৃষ্টি করেছিল। বিচারের শেষে পিতৃদেব মেঘ-মুক্ত চন্দ্রের মতো নিজের পূর্ণ যশের জ্যোতিতে আরো উজ্বল হয়ে দেখা দিলেন। গর্ভামেন্ট তাঁকে আবার পূর্বের কাজে নিযুক্ত করলেন।

গুয়াহাটির স্মৃতি :

লখীমপুর থেকে পিতৃদেব বদলি হয়ে আসেন গুয়াহাটিতে। এখানে এসে লেখকেরা অসমের ইতিহাস রচয়িতা কালীনাথ তামুলী ফুকনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকমলানাথ ফুকনের বাড়িতে উঠেছিলেন। মাত্র কয়েকদিন ফুকনদের বাড়িতে তারা ছিলেন; তার- পরেই লেখকেরা তাঁদের বংশের সু-বিখ্যাত স্বর্গীয় লক্ষ্মীনাথ গজপুরীয়া মহাশয়ের খালি বাড়িতে উঠেছিল।

গুয়াহাটির বিশাল ব্রহ্মপুত্র এবং তার আশ-পাশের পর্বতমালার মনোরম দৃশ্য লেখকের মনে এক অনিবর্চনীয় আনন্দ প্রদান করেছিল; অশ্বক্রান্ত, উমানন্দ, নবগ্রহ, শুক্রেশ্বর, বৈশিষ্ঠাশ্রম আদি তীর্থস্থানে পিতৃদেবের সঙ্গে ঘুরে লেখক অপরিসীম আনন্দ লাভ করেছিলেন। গুয়াহাটিতে এসেই লেখক প্রথম স্কুলে যেতে আরম্ভ করেন। গুয়াহাটিতে ঘর-বাড়ি তৈরি করে থাকার জন্য সেখানকারই স্থানীয় লোকেরা বিশেষ করে লক্ষ্মীনাথ গজপুরীয়া পিতৃদেবকে অনুরোধ করেন। কিন্তু পিতৃদেব নিজের জায়গাতে ফিরে যাওয়াটাই মনস্ত করেন।

অবশেষে শুয়ালকুছির দুটো বড় নৌকা করে লেখকেরা গুয়াহাটি থেকে শিবসাগর যাত্রা করলেন। এই যাত্রায় তাঁদের ২২-২৪ দিন লেগেছিল।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ নদী-পথ যাত্রা শেষ করে লেখকেরা রংপুরের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তখনকার কালে অসমের রাজধানী ছিল রংপুর বা শিবসাগর। এই শিবসাগরের দৃশ্য রাজ প্রতিনীধিদের শহর গুয়াহাটির চেয়ে আলাদা। শিবসাগর সমতল, দু চোখ ভরে যতখানি দেখা যায় তা পর্বত শূন্য নিরাভরণা; মাত্র তার ক্ষীণ হাত দুখানি দিখৌ এবং দিচাং নামের ছোটো নদী একজোড়া দিয়ে যেন উজ্জ্বল করে তুলেছে।

শিবসাগরের স্মৃতি :

'আমার জীবনস্মৃতি'তে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর কৈশোরে দেখা শিবসাগর শহর সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমরা এভাবে সূত্রকারে লেখতে পারি—

(ক) শিবসাগর শহরে বিশাল সুন্দর বড় পুকুর এবং তার তিনটে দেউল যথাক্রমে বিষ্ণুদেউল, শিবদেউল ও দেবীদেউল। বিষ্ণুমন্দির ও দেবীমন্দিরের চূড়ায় রয়েছে ত্রিশূল আর শিবমন্দিরের মাথায় রয়েছে চকমকে শৃঙ্গ। এছাড়া ছিল দিখৌ নদী ও তার প্রবল স্রোত। দিখৌ নদীর ওপারের রংঘর, কারেংঘর, তলাতল ঘর, জয়দৌল ও বিরাট পুকুর লক্ষ্মীনাথের মন খুশিতে ভরে দিয়েছিল।

(খ) শিবসাগরের বাড়িতে লক্ষ্মীনাথের খেলার সঙ্গী তাঁর দুজন ভাইপো। ওরা তাঁর সঙ্গে কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা করত। ওই সময় যেহেতু স্কুলে বাংলা এই পাঠ্য ছিল তাই বাংলা পদ্যই ওরা আবৃত্তি করত। লক্ষ্মীনাথও ওদের থেকে বাংলা কবিতার বই নিয়ে অনেকগুলো পদ্য মুখস্থ করেছিলেন। তাছাড়া বাংলা কিছু মাত্রা গানের পদও ওই সময় লক্ষ্মীনাথের দুই ভাই- পো মুখস্থ করে লক্ষ্মীনাথকে পরাজয় শিকার করতে বাধ্য করেছিল।

(গ) শিবসাগরে বাড়ির পুকুরে লক্ষ্মীনাথ ও অন্যান্য শিশুরা রাত-দিন কারণে অকারণে সাঁতার কাটতেন। ওই পুকুরে একদিন জল উথলে উঠতে লাগল। "চারদিক থেকে জল এসে মধ্যখানে জমা হয়ে পর্বতের উঁচু চূড়োর আকার ধারণ করে, তারপর জলরাশি আবার চারিদিকে আছড়ে পড়তে থাকে। ঠিক যেন পুরীর সমুদ্রের মতো উত্তাল তরঙ্গ— ঢেউয়ের খেলা এই ছোট্ট পুকুরে। এরকমভাবে মিনিট দশেক ঢেউয়ের আলোড়নের পর পুকুরটা আবার সৌম্য শান্তরূপ ধারণ করল। এই ধরনের ঘটনা আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক উপদ্রব ভেবে পিতৃদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করালেন।"

লক্ষ্মীনাথ যখন সাঁতার কাটায় নিপুণ হয়ে উঠলেন তখন একদিন বন্ধুদের সঙ্গে দিখৌ নদীতে সাঁতরে কাটতে গেলেন। তারপর বেশ কয়েকদিনই তাঁরা নদীতে সাঁতার কেটেছিলেন।

(ঘ) লেখকের বাড়ির পুকুরের পাড়ে বুদুরাম মুক্তিয়ার বলে কমলাবাড়ি সত্রের একজন ভক্তকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে সবাই বুদুআতৈ বলে ডাকতেন। তাকে দিয়ে কিশোরেরা একটা ছোটো কাঠের নৌকা তৈরি করিয়ে পুকুরে দিন-রাত চালাত।

এভাবে একদিন জ্যোৎস্না রাতে নৌকা চালানোর সময়ে হাতে-নাতে ধরা পড়লেন পিতার কাছে। ফলে ভীষণ মার পড়ল, নৌকাটাও কেড়ে নিয়ে তক্তাপোষ বানিয়ে দেওয়া হল।

(ঙ) শিবসাগরেই লক্ষ্মীনাথ ও তাঁর এক ভাইপো-র উপনয়ন হয়েছিল। উপনয়নে চার-পাঁচদিন আগে আশে-পাশের অব্রাহ্মণেরা তাঁদের নিমন্ত্রণ করে ভুড়ি ভুড়ি খাওয়ালেন। লক্ষ্মীনাথের উপনয়ন করিয়েছিল ত্রিলোচন শর্মা নামের একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁর সঙ্গের পণ্ডিতদের মধ্যে লম্বোধর ছিলেন একজন। তিনি যখন হোমের ফোঁটা কপালে লাগাতে যেতেন তখন তার হাত ভীষণ ভাবে কাঁপত বলে সেই ফোঁটা কখনও কারোর ভুরুতে, কারো নাকে, কারো গালে পড়ে যেত। তিনি এরকমভাবে ফোঁটা নিজের ইচ্ছেতে দিতেন ফলে লেখকের ভীষণ হাসি পেত।

(চ) লক্ষ্মীনাথের শিক্ষাপর্ব আগে শুরু হলেও শিবসাগরের শিক্ষার কথা তাঁর বিস্তারিত স্মরণে ছিল। এই শিক্ষা ও শিক্ষকদের প্রসঙ্গ আমরা ইতিপূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

২.৩ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সমসমায়িক অসমের সমাজচিত্র

'আমার জীবনস্মৃতি'তে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর জীবনের প্রধান অপ্রধান অনেক কথা বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বেজবরুয়া তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-সজন, বন্ধু-বান্ধব, পড়া-পড়সি প্রভৃতির কথাও যথাযথভাবে বলার প্রয়াস করেছেন। অনিবার্য ভাবেই এই সব বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে। তৎকালীন অসমের সমাজ-ব্যবস্থার অনেক প্রতিছবি। এই প্রতিচ্ছবিগুলিকে আমরা নিজস্ব ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রথমেই বলতে হবে জন্ম-পত্রিকা বা কোষ্ঠী-প্রসঙ্গ। এই থেকে অনুমান করা যায় যে সেই সময় অসমিয়া বর্ণ হিন্দুদের অভিজাত পরিবারে কোষ্ঠী তৈরি করার প্রমাণ ছিল। লক্ষীনাথ বলেছেন, তাঁদের পরিবারে এই কোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেক ভাই বোনদের জন্য তাঁর পিতৃদেব তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেন— সে কোষ্ঠী বাড়ির অন্যান্য ছেলে মেয়েদের মতো অতি যত্ন করে এবং সাবধানে একটা পোঁটলার মধ্যে যে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেই কথাও নিশ্চিত আমি জানি। কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম সেই পোঁটলাটি।" কিন্তু কোষ্ঠী ছোটো ছোটো শিশুদের ধরার অনুমতি ছিল না। তবে বড়ো হলে সেই কোষ্ঠী সকলের দেখার অধিকার ছিল।

সেই সময়ে অর্থাৎ লক্ষীনাথের ছোটোবেলায় তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যায় যে অসমের সমাজ-ব্যবস্থায় জন্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে হেলে এবং মেয়ে সংক্রান্ত আচার আদি পৃথক পৃথক। যেমন ছেলে জন্মালে লোকে উলু দেয়, শঙ্ক-ঘন্টা বাজায়। মেয়ে জন্ম হলে ঢেঁকি ভানে, কুলো বাজায়। লক্ষ্মীনাথের জন্মের সময়েও এই রকম হয়েছিল বলে পরিবর্তীকালে কেউ তাঁকে বলে দিয়েছিলেন।

অসমের সমাজে কৃষি এবং ধান-প্রসঙ্গ সব সময়েই প্রধান উল্লেখযোগ্যের বিষয়। 'আমার জীবনস্মৃতি'তে এমন প্রসঙ্গের একাধিক উল্লেখ রয়েছে। যেমন—কোমল চাউলের প্রসঙ্গে দেখি লক্ষ্মীনাথের স্মৃতি-কথা অনুযায়ী বরপেটা সত্রে যখন তিনি শিশুকালে পিতার সঙ্গে যেতেন, তখন তাঁদের সত্রের অধিকারীর ঘরের ভিতর নিয়ে হাতির পদচিহ্ন আঁকা বাটিতে সুভাষিত কোমল চাউলের সঙ্গে মোষের দুধ ও গুড় মিশিয়ে, জল পাণের জন্য দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে স্কুল জীবনের কথা বলতে গিয়েও লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া কোমল বা বোকা চাউলের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। ছেলে-বেলা বাংলা স্কুলে পড়ার সময় ছাত্র লক্ষ্মীনাথ পেট ব্যাথার জন্য দুটি চাওয়ায় হেড পণ্ডিত তারকবাবু লক্ষ্মীনাথকে কোমল চাউল খাওয়ার বিপক্ষে রসিকতা করে অনেক কথা শুনিয়ে দেন। কারণ সেই সময় অনেক বাঙালি বাবুরা অসমিয়াদের কোমল চাল খাওয়াটাকে অসভ্যতার নিদর্শন বলে সম্ভবত মনে করতেন।

সেই সময়ে অসমিয়া বর্ণহিন্দু পরিবারে খাদ্য তালিকায় মাংস খাওয়ার চল ছিল বটেই কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিধি নিষেধের গণ্ডিদেওয়া থাকত, যেমন— মাদীপশুর মাংস খাওয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার পরিবারে নিষিধ ছিল। ফলে বরপেটা থেকে তেজপুর যাওয়ার পথে ব্রহ্মপুত্রের পারে যে সদ্য মৃত মাদী হরিণটি পাওয়া যায়, লক্ষ্মীনাথের পিতৃদেব নিজের সন্তানদের সেই মাংস খেতে দেননি এবং নিজেও খাননি। খেয়েছিল নৌকার মাঝি-মাল্লারা। এছাড়াও মুরগির মাংস খাওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু নিষেধ অসমিয়া হিন্দু-সমাজের ক্ষেত্রে ছিল বলে লক্ষ্মীনাথ প্রকাশ করেছেন। হরনাথ পার্বতীয়ার পুত্র হরিরাম বরুয়া লেখকদের বাড়িতে থাকতেন সেই সময় লেখকের মনে কে যেন ঢুকিয়ে দিয়েছিল যে হরিরাম হিন্দুর অখাদ্য মুরগির মাংস ভোজন করেন। আর এই জন্য তাঁর ঘরের দিকে লক্ষ্মীনাথ যেতেন না। একবার মুরগির মাংস বলে একটু পায়রার মাংসের হাড় লক্ষ্মীনাথের দিকে ছুঁড়ে দেওয়ায় লক্ষ্মীনাথ ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

'আমার জীবন স্মৃতি'তে উল্লেখ আছে যে ওই সময়ে অসমে পুরুষদের কম বয়সে বিয়ে করার প্রচলন ছিল না। প্রায় ৩০-৩৫ বছরে উপার্জনে সক্ষম হলে তবে তার বিবাহ করার বয়স হতো। কিন্তু বেজবরুয়া আক্ষেপ করেছেন যে কিছু কিছু জায়গায় বঙ্গদেশের প্রভাবের ফলে অসমিয়া সামাজিক ব্যবস্থায় এই পুরোনো প্রথা বদলে দিয়ে শ্বশুড় বাড়িতে টাকা-পয়সা নিয়ে কম বয়সে বিয়ে করার প্রথা হয়েছিল। অসমে সেই সময় অসমিয়া সমাজে যৌতুক প্রথা ছিল না। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া নিজের বিবাহ সংক্রান্ত কথায় তার সাক্ষ্য মেলে। যখন লক্ষ্মীনাথের বিয়ে ঠিক হল ঠাকুর বাড়িতে, তখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী লক্ষ্মীনাথকে এসে জিজ্ঞাস করে যে এই বিয়েতে যৌতুক হিসেবে তাঁর কী চাহিদা। বঙ্গদেশে সেই সময় অনেক শিক্ষিত যুবকও মুখে যৌতুক প্রথাকে অস্বীকার করলেও তলে তলে বিয়ের সময় কন্যা পক্ষের থেকে পণ আদায় করত। কিন্তু অসমিয়া সমাজে এই রকম না থাকার ফলে লক্ষ্মীনাথ উত্তর দিলেন যে — "আসামে অসমীয়া লোকেদের মধ্যে টাকা নিয়ে মেয়ে বিয়ে করার প্রথা নেই। অসমীয়ারা এই প্রথাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। আমি বঙ্গদেশের ভিতরে শিক্ষিত সুমার্জিত আর শ্রেষ্ঠ

পরিবারের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি আছি কিন্তু টাকা নিতে রাজি নই।"

অসমে সেই সময় প্রচলিত দুর্গোৎসবের কথাও 'আমার জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন লক্ষ্মীনাথ। দুর্গেশ্বর শর্মা নামের কেরানি যিনি লখীমপুরের লক্ষ্মীনাথের প্রতিবেশ ছিলেন, খুব ভালো দুর্গার মূর্তি তৈরি করতেন। দুর্গা পূজার একমাস আগে থেকেই এই মূর্তি তৈরির কথা শুরু করে দিতেন। প্রতিমা তৈরি করার প্রথম দিন থেকেই লক্ষ্মীনাথের মতো শিশুরা তার কাছে যাতায়ত করত এবং কাদামেখে, খড়ে মাটি বেঁধে, নানাভাবে শর্মা মহাশয়কে সহায়তা করত। প্রতিমার গায়ে যখন সাদা, হলদে, লাল রং বেটে নিয়ে তিনি লাগাতেন তখন প্রতিমা ভীষণ সুন্দর হয়ে উঠত। কোথা থেকে এই রং পেয়েছেন জানতে চাইলে শর্মা উত্তর দিতেন এই রঙ্‌গুলি, আকাশের থেকে কিনে এনেছেন এবং পূজোর সময় দেবতারা শুধু তাকেই এই রঙ্‌গুলো দেন। এই দুর্গেশ্বর শর্মা স্নেহবশত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকে একটি মাটির বাঁশি তৈরি করে দেন, যে বাঁশির সুর লক্ষ্মীনাথকে আনন্দিত করে তুলেছিল।

স্বর্ণালংকার প্রস্তুত করার যে রীতি সেই সময়ের অসমিয়া সমাজে প্রচলিত ছিল তারও উল্লেখ করেছেন লক্ষ্মীনাথ। সিধেশ্বর কর্মকার বলে যে ব্যক্তিটি জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত আছেন, তার কারখানায় গিয়ে শিশুরা লক্ষ করত কি করে তিনি স্বর্ণালংকার তৈরি করেন। স্বর্ণালংকারে দেওয়া মাটির পাত্র, ছাগলের চামড়া পাখা চালিয়ে হাওয়া দেওয়া হতো। সোনা-রূপাগুলো ঠাণ্ডা জলের পাত্রে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে শক্ত করে নিয়ে অলংকারটিকে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে কত রকমেরই না অলংকার তৈরি করতেন তিনি। সিধাই কর্মকার কানের দুল ও হাতের বালাতে লাল, নীল আর কলা পাতা রঙের কাঁচের নকল পাথর থেকে তার এক এক টুকরো আসল পাথরের সঙ্গে মিলিয়ে বসিয়ে দিতেন এবং তার উপর ভীষণ সুন্দর মিনার কাজ করতেন। একবার লক্ষ্মীনাথের পিতা তাঁর মায়ের জন্য ১২০০/- টাকা মূল্যের একাজোড়া বালা এই সিধাই কর্মকার থেকে গড়িয়ে নিয়েছিলেন।

অসমে সেই সময় যাত্রাপালার খুব প্রচলন ছিল। লক্ষ্মীনাথের জীবনস্মৃতিতে লখীমপুরে থাকা সময় সেরকম যাত্রাপালার প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে, কমলা বাড়ির সত্রের সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের পিতার খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। সেই সত্রের ভক্তিরা বাড়িতে এসে যাত্রা অভিনয় করেছেন। লক্ষ্মীনাথ স্মরণ করেছেন একটি মাত্রা পালার নাম ছিল 'মঙ্গল কাঠুরীয়ার যাত্রা'। যাত্রার কাহিনিটি এ-রকম — এক মঙ্গলবারে মঙ্গলা কাঠুরিয়া কাঠ কাঁটতে জঙ্গলে গেল, প্রতিবেশিরা দিন ভালো নয় বলে সেদিন ওকে জঙ্গলে যেতে নিষেধ করে, কিন্তু মঙ্গলা কারো কথা শুনল না, সে জঙ্গলে যায় এবং বাঘ তাকে মেরে ফেলে, লক্ষ্মীনাথের পিতা এবং পরিবারের সবাই বসে সেই যাত্রা-পালা দেখেছিলেন, মঙ্গলা কাঠ কাঁটবার সময় পেছন দিক থেকে মুখোস পড়া একটা বাঘ এসে হাজির হয় এবং সেটা দেখে লক্ষ্মীনাথের দাদা শ্রীনাথ চিৎকার করে দৌড়ে পালায়। যাত্রা সভায় হাসির রোল উঠল। এটা দেখে রবিদাদু শ্রীনাথকে টেনে এনে কোলে বসিয়ে রেখেছেন।

আর এদিকে নাটকে মঙ্গলা কাঠুরীয়াকে বাঘ ক্রমে গিলে খেয়ে ফেলে। বালক লক্ষ্মীনাথের এইভেয়ে অত্যন্ত অদ্ভুদ লেগেছিল যে ঘর ভর্ত্তিলোকের সামনে একটা বাঘ এসে একজন সজীব মানুষকে খেয়ে ফেলছে অথচ কেউ টু-শব্দটি করল না— এটা কেমন করে সম্ভব।

আরেকটা যাত্রাপালার কথাও লক্ষ্মীনাথ উল্লেখ করেছেন এই প্রসঙ্গ, সেটার নাম ছিল সম্ভবত 'জড়াসন্ধ বধ' । সেটা দেখে উৎসাহিত হয়ে লক্ষ্মীনাথ ও তাঁর দাদা শ্রীনাথ কলাগাছের গোড়া কেঁটে নিয়ে দুটো গদা তৈরি করে যুদ্ধ শুরু করেন আর বীর রসাত্মক পদ গেয়ে বিক্রম প্রকাশ করতেন। দুজনের তুমুল যুদ্ধ দেখে বাড়ির মহিলারা ও চাকরেরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। একসময় সেই যুদ্ধের তেজ এতো বেড়ে গেল যে শিশুদের সুপারভাইজার রবিনাথ দাদু কঠোর নির্দেশ করে এই যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্যোগ নেন।

যাতায়ত ব্যবস্থার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলা যায় যে সেই যুগে যাতায়তের প্রধান মাধ্যম ছিল নৌকা বা জাহাজ অথবা এই ভাবেও বলা যায়— সেই যুগে যোগাযোগের প্রধান পথ ছিল জলপথ। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় দীননাথ বেজবরুয়া মুন্সে কাজে নগাঁও থেকে বদলি হয়ে যখন নৌকা করে বরপেটা যাচ্ছিলেন সেই সময় ব্রহ্মপুত্রের চরে লক্ষ্মীনাথের জন্ম। আবার দেখি বরপেটা থেকে তেজপুর বদলি হয়ে যাওয়ার সময়ও সবাই নৌকা করেই যাত্রা করেছেন। আরেক জায়গায় লক্ষ্মীনাথ লিখেছেন যে তাঁরা লখীমপুরে থাকার সময়ই তাঁর দুই দাদা শ্রীগোবিন্দ বেজবরুয়া ও শ্রীনাথচন্দ্র বেজবরুয়া কলকাতায় পড়তে গিয়ে ছিলেন, তখন অসমে রেল চলত না বা ডাক জাহাজের প্রচলন ছিল না একমাত্র সদাগরী জাহাজগুলো চলাচল করত। কলকাতায় পৌঁছাতে ১৫-২০ দিন লেগে যেত।

সামাজিক চিত্র হিসাবে 'আমার জীবনস্মৃতি'তে পৈতা বা উপনয়ন প্রসঙ্গে উল্লেখও করেছেন লক্ষ্মীনাথ। লক্ষ্মীনাথ এবং তাঁর ভাইদের উপনয়ন এক সঙ্গে হয়ে ছিল। যদিও ছোটোবেলাতেই তাঁর কানে ফুটো করে দেওয়া হয়েছিল। তবুও উপনয়নের দিন ব্রাহ্মণের দশ সংস্কারের মধ্যে একটা সংস্কার হিসাবে সেইদিন আবার কর্ণ ভেদ হল। উপনয়নের কয়দিন আগে থেকে তাদের টোলে যে ব্রাহ্মণেরা বসে করতেন তারা এই শিশুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। কারণ কারো ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও পৈতা না দেওয়া পর্যন্ত ছেলেরা শূদ্রই থাকে। এখানে লক্ষণীয় সামাজিক সংস্কারকে সামান্য ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে এই ধরনের শূদ্রত্ব ব্রাহ্মণের ঘরের বিড়ালের মতো, কারণ ব্রাহ্মণের ঘরের বিড়াল যদি শূদ্রদের ঘরে পোড়া মাছ আর পান্তা ভাত চুপি চুপি খেয়ে এসে আবার ব্রাহ্মণের ঘরে মাছ ভাজা খায় তাহলেও ব্রাহ্মণের বাড়া ভাত অশুচি হয় না, কারণ বিড়ালে কোনো আচরণ দেখে হতবুদ্ধি না হয়ে সেই অন্যকে মন্ত্র দিয়ে শুদ্ধ করে দেবতাকে অর্পণ করে নিজে খেলে দোষ নেই। পৈতে হওয়ার পরই ব্রাহ্মণ হয়ে গেলে তখন আর শূদ্রের বাড়িতে খাওয়া যাবে না। সেইজন্য তারা আগেই সেই শিশু খাইয়ে তৃপ্তি লাভ করেছিলেন।

এইভাবে দেখা যায় 'আমার জীবনস্মৃতি'তে তৎকালীন অসমের বিভিন্ন সামাজিক ঘটনা পরিঘটনা নানা স্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

২.৪ লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার জীবনের শিক্ষকদের প্রভাব

'আমার জীবনস্মৃতি'তে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া আত্ম-কথা বলতে গিয়ে তাঁর পড়াশোনার কথাও ব্যক্ত করেছেন। শিশুকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা এবং শিক্ষা-জীবনের বিভিন্ন ঘটনা তাঁর আত্মস্থ স্থান পেয়েছে। এমনই একই প্রসঙ্গ হল তাঁর ছাত্রজীবনে শিক্ষকদের অল্পমধুর স্মৃতি। লক্ষ্মীনাথ বলেছেন, গুয়াহাটিতে এসেই তিনি প্রথম স্কুলে যেতে শুরু করেন। প্রথম স্কুলটা জেলখানার মতো মনে হয়ছিল। লক্ষ্মীনাথ যেন খাঁচার পাখি। পর দিন স্কুল যাওয়ার চিন্তা তাকে মন মরা করে দিত। স্কুলে গিয়ে বেতহাতে মাস্টার মশাইদের গুরু-গম্ভীর শব্দ শিশু লক্ষ্মীনাথকে ভয় পাইয়ে দিত। কোনো কিছু শেখা বা দূরের কথা, বাড়ি থেকে যেটা শিখে আসতেন তাও ভুলে যেতেন, ওই স্কুলের যিদি অঙ্কের মাস্টার তাঁর নাম ছিল সাখাওৎ আলি। তাঁকে দেখলেই লক্ষ্মীনাথের মাথায় অংকগুলো সব গণ্ডগোল হয়ে যেত। ওই শিক্ষক তাঁর লাল চোখ ও তার তীক্ষ্ণ বাক্য-বাণ নিয়ে যতই উত্তরের আশা করতেন, ততই নিরাশ হয়ে লক্ষ্মীনাথের থেকে উত্তর না পেয়ে। লক্ষ্মীনাথ বলেছেন যে গুয়াহাটির স্কুল তাঁর কাছে আনন্দালয় না হয়ে জমালয় হয়ে উঠেছিল। তৃতীয় শ্রেণিতে তিনি যখন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন, সেই সময় স্কুলে বাংলা ভাষা পড়ানো হতো। অসমিয়াদের মাতৃভাষা যে বাংলা নয়, অসমিয়া এটা না বুঝে সরকার অসমে 'আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়' নাম দিয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। শিবসাগরে এরকম একটি স্কুলে লক্ষ্মীনাথকে প্রথম ভর্ত্তি করিয়ে দেওয়া হয়। স্কুলের হেড-পণ্ডিত আর দ্বিতীয় পণ্ডিতের ছেলে ছিলেন বাঙালি। তৃতীয় পণ্ডিত থেকে শুরু করে বাকি সবাই ছিলেন অসমিয়া। হেড পণ্ডিতের নাম ছিল তারকবাবু। দ্বিতীয় পণ্ডিতের নাম ছিল প্রাণকৃষ্ণ কর। তৃতীয় পণ্ডিত যিনি বাংলা পড়াতেন তাঁর নাম লম্বোদর। লম্বোদর পণ্ডিতের গায়ের রং কালো। মুখে বসন্তের দাগ এবং বয়সে যুবক ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষা অসমিয়া উচ্চারণের ঢঙ্গে পড়াতেন। এই বাংলা স্কুলে পড়ার সময়কার দুটো ঘটনা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া স্মরণ করেছেন। একদিন তিনি পেট ব্যথা বলে হেড পণ্ডিত তারকবাবুর কাছে ছুটি চান — তখন তারকুবাবু বালক লক্ষ্মীনাথকে কোমল চাউল খাওয়ার বিপক্ষে রসিকতা করে অনেক কথা শুনিয়েদিয়েছিলেন। পেট ব্যাথার দরখাস্তে পেট ব্যথার উল্লেখ থাকায় তারকবাবু এই সুযোগ পেয়েছিলেন। রসিকতা শুনে লক্ষ্মীনাথের ভীষণ লজ্জাবোধ হয়েছিল। কোমল চাউল খাওয়াটা যে একটা খারাপ কাজ, তারকবাবুর আগে এই কথা এমনভাবে কেউ বলেননি। যদিও লেখক বলেছেন যে হেড পণ্ডিত নিজেই সেই ব্যাথার জন্য নাগার্জুনের বড়ি সেবন করতেন।

এরপর লক্ষ্মীনাথকে ইংরেজি স্কুলের ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেখানে তিনি লোকনাথ শর্মা নামের শিক্ষককে পেয়ে যান। তাঁর ডাক নাম ছিল টেপু মাস্টার। তিনি ভয়ানক নিয়ম প্রিয় শিক্ষক ছিলেন। ছেলেদের পড়াশোনার চেয়েও নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকে তার নজর থাকত বেশি। স্কুল বা বাড়ির নিয়ম-শৃঙ্খলা ছেলেরা যাতে ঠিক ভাবে পালন করে তার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। কেউ যদি অল্প নিয়মও লঙঘন করত

তবে তার পিঠে বেত্রাঘাত ছিল অবধারিত। নিজের বাড়িতে কোনো ছাত্র যদি নিয়ম-শৃঙ্খলার বাইরে কোনো কাজ করে, যেমন-দাদার সঙ্গে মুখে মুখে উত্তর দেওয়া কিংবা বড়োদের কাজের গাফিলতি করে না করা ইত্যাদি কোনো কথা ওঁর কাছে এলে তিনি তখন হয় বেত মেরে না হলে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে শিশুদের শাস্তি দিতেন। তিনি যখন ক্লাসে বসে শিশুদের মারার জন্য মুখ বেকিয়ে দিতেন বা ঠোঁট ফুলিয়ে অঙ্গভঙ্গি করতেন, তখন হাসি থামানো মুশকিল ছিল। ফলে পিঠে হাতের তালুতে বেতের বারি খেতে হতো, কিন্তু লোকনাথ শর্মা আমুদের লোক ছিলেন।

শ্রীযুত ধর্মেশ্বর শর্মা নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। ওই বিদ্যালয়ে তিনি খুব কড়া না হলেও তাঁর পড়ার মাত্রাটা একটু বেশি ছিল যে সবাই কষ্ট করে সেটা সহ্য করত। তার মাথায় টাকছিল এবং সেই জন্য তার উপস্থিতিতে শিশুরা তাকে টাকমাথা বলে ডাকত।

ওই স্কুলে মোতিলাল নামে প্রথম ক্লাসে পড়া ছাত্র ছিলেন। কখনো কখনো তাঁকে ও ছোটোক্লাসে পড়ানোর জন্য পঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি যখন ক্লাসে আসতেন তখনই তিনি কাউকে না কাউকে হয় বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিতেন নতুবা ক্লাসের বাইরে বের করে দিতেন। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ নামে একজন শিক্ষক একটু উঁচু ক্লাসে লক্ষ্মীনাথকে পড়িয়ে ছিলেন। তিনি মৃদু স্বভাবের ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত তোয়ধর শর্মা নামে একজন শিক্ষক স্কুলে সংস্কৃত পড়াতেন। সংস্কৃতে তার গভীর বৎপত্তি ছিল, তিনি সাজ-পোষাক করতেন পুরাতন রীতিতে। এক দিন তিনি মুগার ধুতি পড়ে এলে একটি ছেলে বলে উঠল আজকে স্যার মুগার ধুতি পরে এসেছেন, এই কথায় খুব রেগে গিয়ে পণ্ডিত বলেন, আমি কি তোর বাবার পয়সার ধুতি কিনেছি? ছাত্ররা এই কথা শুনে খিক্‌খিক্‌ করে হাসতে থাকে, লক্ষ্মীনাথও এর মধ্যে ছিলেন। লক্ষ্মীনাথের পিতৃদেবের সঙ্গে এই শিক্ষকের ভালো সম্পর্ক থাকায় তিনি লক্ষ্মীনাথকে তিরস্কার করে বলেন— তুমি সিংহ সাবক হয়ে শৃগালের মতো আচরণ করছো কেন? ওই দিন থেকে লক্ষ্মীনাথ আর দুষ্ট ছেলেদের সঙ্গে মিশবেন না বলে সংকল্প করেন।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া বলেছিলেন যে এটা খুবই আশ্চর্য কথা এতজন শিক্ষকের কাছে পড়লেও মনের দিক থেকে একজন শিক্ষকও তাঁর মনের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা আকর্ষণ করতে পারেননি, তিনি আরো বলেছেন যে সম্ভবত এটা শিক্ষকের ত্রুটি ততটা নয়, যতটা শিক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি। অবশ্য মাস- খানিকের জন্য শ্রীযুক্ত কেশবনাথ ফুকন যখন ওই স্কুলে শিশুদের পড়িয়ে ছিলেন, তাঁর বোঝানো এত প্রাণ-উজ্জ্বল ও সহজ ছিল যে শিশুরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

লক্ষ্মীনাথদের স্কুলে সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁরা দীর্ঘকাল অসমের লোক, কিন্তু তিনি একটাও অসমিয়া কথা বলতে পরতেন না। তিনি বেশিদিন এই স্কুলে ছিলেন না। বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর সম্পর্কে তিনটি কথা লক্ষ্মীনাথের মনে গাঁথা ছিল — প্রথমত, তার গোফ ছিল অন্যদের থেকে লম্বা। দ্বিতীয়ত, তিনি

নবাবী সুরে কথা বলতেন এবং সব কথার শেষে অবকর্স (offcourse) শব্দটো প্রচুর ব্যবহার করতেন। তৃতীয়ত, তিনি যে অন্যের চেয়ে ভালো ইংরেজি জানেন সেটা বোঝাবার জন্য সবার ইংরেজি ভুল ধরতেন।

এই স্কুলের হেডমাস্টারের নাম ছিল শ্রী শ্রীনাথ গুহ। অসমে সত্রের গোসাঁইরা দু-বার করে শ্রী শিখতেন বলে বালক লক্ষ্মীনাথ ভেবে ছিলেন যে শ্রীনাথবাবু বঙ্গদেশের কোনো সত্রের গোঁসাই। শ্রীনাথবাবু বেশ মোটা-সোটা ছিলেন। আর তাঁর গায়ের রং ছিল কালো। তাঁর গলার গমগমে আওয়াজ সমস্ত স্কুল-ঘরকে কাঁপিয়ে তুলত, বেলা ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত তিনি তাঁর প্রথম শ্রেণির ক্লাসে না গিয়ে স্কুলের একপাশে একেটা টেবিলে বসে অফিসের কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকতেন, আর মাঝে মাঝে বলতেন 'সাইলেন্ট'। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর গর্জন সারা স্কুল তোলপাড় লাগিয়ে দিত। এই গর্জনের মানে ছিল যে তোরা ভাবিস না যে হেড মাস্টার শুধু কাজ নিয়ে ব্যস্ত, তোদের দিকে নজর নেই, তাঁর দৃষ্টি সজাগ, ক্লাসের কোনো ছেলের ব্যবহারে একটু ব্যতিক্রম দেখতে পেলে তিনি 'ইউ ইউ' বলে তাকে কাছে ডেকে বেত মেরে বুঝিয়ে দিতেন যে সবই তার নজরে আছে। লক্ষ্মীনাথের কপালেও একদিন বেতের বারি জুটে ছিল, ওদের ক্লাসে মহিকান্ত বলে একটা দুষ্ট ছেলে ছিল। সে লক্ষ্মীনাথের সঙ্গে যখন পাঞ্জা খেলছিল, হঠাৎ করে "হেড মাস্টারের" চোখে সেই পড়ে যাওয়ায় তিনি লক্ষ্মীনাথকে 'ইউ' বলে ডেকে নিয়ে যান এবং দু-ঘা লাগিয়ে দেন। শ্রীনাথবাবুর এক ছেলে ছিল তার নাম অতুল। সে হেড মাস্টারের ছেলে, এই জন্য সারা স্কুলে যে সম্ভম ও কৌতূহলের পাত্রছিল। বেলা ২টার সময় বাড়ি থেকে হেড মাস্টার ও তার ছেলের জন্য খাওয়ার আসত। হেড মাস্টার স্কুল থেকে বেড়িয়ে সেই টিফিন খেতেন। যাইহোক, শ্রীনাথবাবুর কাছে লক্ষ্মীনাথের বেশি দিন পড়া হল না। কিছু দিন পর শিবসাগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

এরপর লক্ষ্মীনাথের পড়ার সুযোগ হয় অসমের প্রসিদ্ধ শিক্ষক চন্দ্রমোহন গোস্বামীর কাছে। সর্ব বিষয়ে তার মতো এমন পণ্ডিত অসমে হেড মাস্টার হিসেবে কোন দিন কাজ করেননি। তবে চন্দ্রের কলঙ্কের মতো চন্দ্রমোহনের চরিত্রেও কলঙ্ক ছিল— সেটা হল অতিরিক্ত মদ্য পান। চাঁদের মতো চন্দ্রমোহনেরও মাসে দু-পক্ষ ছিল — একবার মদ খেতে শুরু করলে এক নাগারে ১৫ দিন তিনি মদ খাবেন, আর তার পরের ১৫ দিন একেবারে শুদ্ধ পটপটে। একদিন তিনি এমনই এক কৃষ্ণপক্ষে অর্থাৎ মদ খাওয়া অবস্থায় স্কুলে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সঙ্গী করে নিয়ে এলেন শিক্ষক প্রাণকৃষ্ণ কর, কিন্তু গোস্বামীর পেণ্টের ভিতর থেকে যে ধুতির কোচ ঝুলছিল তা প্রাণকৃষ্ণ বাবুর নজরে এতিয়ে যায়, ফলে গোস্বামী যখন বিভিন্ন ক্লাসে ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্ন করে বেড়িয়েছেন তখন সেই ধুতির কোচাটা জাতীয় পতাকার মতো ঝুলছিল। এরকম দৃশ্য দেখে ছাত্ররা খুব মজা পাচ্ছিল আর হাসছিল।

চন্দ্রমোহন বিদ্যার গৌরব অর্জন করেছিলেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো। কলেজের পড়া শেষ করে লক্ষ্মীনাথ যখন সংসার- জীবনে প্রবেশ করেছেন তখন অসমে বা কলকাতায়

যতবারই গোস্বামীর স্যারের সঙ্গে দেখা হয়েছে তখনই শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে লক্ষ্মীনাথের মাথা নত হয়েছিল। 'জোনাকী', 'বাহি' নামে মাসিক পত্রিকা মধ্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার যে প্রবন্ধগুলো বের হতো সেগুলো পড়ে তিনি খুব আনন্দ পেতেন আর এই বিষয়ে নিজের মতামতও প্রকাশ করতেন।

আত্মজীবনীতে বর্ণিত সমস্ত শিক্ষকদের কথা লক্ষ্মনাথ হয়তো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তুলে ধরতে পারেননি, কিন্তু তবুও যে কয়জন শিক্ষক বাল্যকালে তাঁকে বিভিন্ন সময় পড়িয়ে ছিলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা করেছেন। আত্মজীবনীর অংশ হিসাবে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই বিভাগে আমরা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'আমার জীবনস্মৃতি'র আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করেছি। এই বিভাগে আলোচিত হয়েছে অসমের বিভিন্ন শহরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা লক্ষ্মীনাথের স্মৃতি, তাঁর সমসাময়িক জীবনের সমাজচিত্র এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বাল্যকালে শিক্ষালাভ করা শিক্ষকদের প্রভাব।

২.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

(১) 'আমার জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত অসমের সমাজ-জীবন সম্পর্কে নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

(২) জীবনী ও আত্মজীবনীর পার্থক্য উল্লেখ করে 'আমার জীবনস্মৃতি' কোন্ শ্রেণিতে পড়বে বুঝিয়ে দিন।

(৩) 'আমার জীবনস্মৃতি'তে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর শিক্ষা ও শিক্ষকদের সম্পর্কে কী বলেছেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৪) লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর আত্মজীবনীতে যে প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন তা সংক্ষেপে লিখুন।

(৫) জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের সম্পর্কের কথা বিশদভাবে আলোচনা করুন।

(৬) কলকাতায় ছাত্রাবস্থাতে লক্ষ্মীনাথের কর্মকাণ্ড কীরূপ ছিল তা নিজের ভাষায় লিখুন।

(৭) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন—

(ক) জোনাকী

(খ) বাঁহী

(গ) রবিনাথ মাজুদলর বরুয়া

(ঘ) কমলাবাড়ি সত্র

(ঙ) দীননাথ বেজবরুয়া

(চ) সুরভী

(ছ) ধনী

(জ) চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা

২.৭ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

(১) বেজবরুয়া গ্রন্থাবলি ১ম খণ্ড

(২) বেজবরুয়া গ্রন্থাবলি ২য় খণ্ড

(৩) ড° প্রফুল্ল কটকী : সাহিত্যরথী

(৪) অতুলচন্দ্র হাজরিকা (সম্পা) : বেজবরুয়ার অসমীয়া ভাষা আরু সাহিত্য

(৫) ড° সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা : অসমীয়া সাহিত্যর ইতিবৃত্ত

(৬) পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া : অসমর বুরঞ্জী

(৭) লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া : (অসম প্রকাশন পরিষদ)

(৮) জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা : বেজবরুয়া প্রতিভা

(৯) বাণীকান্ত কাকতি : লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া

(১০) মহেন্দ্র বরপূজারী : বেজবরুয়া, গোহাঞি বরুয়া আরু সমকালীন অসমর সমাজ জীবন

* * *

বিভাগ-৩

ভারতজোড়া গল্পকথা

ভারতজোড়া গল্পকথা : প্রসঙ্গ-কথা ও নির্বাচিত গল্পের আলোচনা

বিষয় বিন্যাস

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৩.২ ছোটোগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ বিচার

৩.৩ ভারতজোড়া গল্পকথা : নির্বাচিত গল্পগুলির আলোচনা

৩.৪ ভারতজোড়া গল্পকথা : নির্বাচিত গল্পের নামকরণ ও চরিত্র-বিচার

- ৩.৪.১ মাছ ও মানুষ
- ৩.৪.২ টোবা টেক সিং
- ৩.৪.৩ বিজয় উৎসব
- ৩.৪.৪ ইলিশ মাছের স্বাদ

৩.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৩.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

৩.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৩.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৩.০ ভূমিকা (Introduction)

'নানা জাতি নানা ভাষা নানা পরিধান। বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান' — বৈচিত্রের মধ্যে এই ঐক্যই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। আদিমকাল থেকেই এই দেশ বিভিন্ন জাতি এবং সভ্যতার মিলনভূমি। ইতিহাসের শুরু থেকেই নানা ধর্ম আর নানা বর্ণের মানুষ এসে ভারতীয় স্রোতে আত্মস্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গেই 'ভারততীর্থ' কবিতায় বলেছেন—

> "হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
> শক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।
> তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
> বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।"

ভারতবর্ষকে এই চেনা ও জানার প্রচেষ্টা চলেছে বহুকাল ধরেই। শুধু যে

ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক-ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই দেশকে আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে তা কিন্তু নয়, রয়েছে রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক-প্রশাসনিক নানা উদ্যোগও। এর পাশাপাশি সাহিত্যেরও একটা ভারত-ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল। 'মহাভারত' নামকরণ সম্ভবত এই ভাবনারই ফসল। রামায়ণেরও ভৌগোলিক বিস্তার কম নয়, রাম-সীতার পদচিহ্ন প্রায় সারা ভারতবর্ষ জুড়েই মেলে। সতী দেহের যে একান্ন খণ্ড তাও ছড়িয়ে আছে প্রায় সমগ্র দেশে এবং তা থেকে তৈরি হয়েছে নানা সতীকথা সতীগাথা। এমনকি ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠীর যে প্রবাহ, প্রহেলিকা, লোককথা— যা একান্তভাবে স্থানিক— তাও কীভাবে যেন অন্য জনপদে পৌঁছে যায়। তাই উত্তর-পূর্ব ভারতের লোক-কাহিনির সাপ প্রায় একইরকমভাবে রাজস্থানে দুর্জন দমন করে। আসামের 'বিয়ানাম' এবং উড়িষ্যার 'কান্দোনা' সমগোত্রীয়। অসমিয়া 'তেজিমলা'ই উড়িষ্যার 'চম্পাবতী'। বাংলার দুখিনী মায়ের কথা পঞ্জাবের উপকথায় চোখের জলে সমাপ্তি পায়। হয়তো এভাবেই আমাদের অগোচরে বীজ রোপন হয় 'ভারতীয় সাহিত্য' ভাবনার। তৈরি হয় সাহিত্য অকাদেমি-সহ বেশ কয়েকটি সর্বভারতীয় সরকারি বেসরকারি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান। শুরু হয় অনুবাদের মধ্য দিয়ে এক ভাষার সাহিত্য অন্য ভাষার পাঠক-লেখকদের কাছে পৌঁছে দেবার এক বৃহত্তর প্রচেষ্টা। এর ফলে আমরা যে শুধু নান্দনিক দিকে সমৃদ্ধ হলাম এমন নয়, নিজের দেশকে অন্যভাবে চিনতে ও জানতে শুরু করলাম।

'ভারতজোড়া গল্পকথা'য় স্থান পেয়েছে আঠারোটি ভাষার পঁয়তাল্লিশটি গল্প। একশো বছরের ভারতীয় জীবনের একটা চালচিত্র ভেসে উঠে চোখের সামনে। বিচিত্র এই দেশের কত ধরনের যে মানুষ মাঝ-দরিয়ার জেলে, বিভাজিত দেশের পাগল, আধুনিক প্রেমহীন নারী, প্রাণহীন শহুরে সন্ধ্যা, আধন্যাংটো আদিবাসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা, স্বদেশে শরণার্থী মানুষ, বন্যার্ত কুকুর, অপাংক্তেয় বুড়ো বাবা-মা, অন্নহীন নিপীড়িত লোকজন— যেন চিত্রশালার সর্বভারতীয় এক মুখাবয়ব প্রদর্শনী। দিন ও রাতের কত বিভিন্ন রঙ! প্রকৃতির কত কোমল ও কত রুদ্র রূপ! মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের দুর্গে ফাটল দেখা দেয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। সাহিত্য যেহেতু সমাজেরই দর্পণ, তাই সমাজের এই অস্থিরতাকে স্বাভাবিকভাবেই তুলে ধরেছেন আলোচ্য সংকলনের গল্পকাররা। তাছাড়াও ছিল সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের প্রভাব। এই পালাবদল, মানুষের সার্বিক বিনষ্টির ছবি প্রথম থেকেই চোখে পড়ে। সমকালীন যুগযন্ত্রণার স্পষ্ট উপস্থিতি রয়েছে এঁদের লেখায়। নতুন নতুন বিষয়ের আমদানি ছাড়াও এই লেখকদের বর্ণনাভঙ্গি ও আঙ্গিকও অনেকটাই নতুন। তবে একটা কথা এখানে না বললেই নয় যে এই লেখকেরা সবাই সমগোত্রীয় হলেও কিন্তু সমমনস্ক নন। জীবনবোধে ও স্বাভাবিক রুচিভেদে এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রধর্মী। বিষয়ের দিক দিয়ে কিছু কিছু গল্পের মধ্যে মিল হয়তো আছে কিন্তু লেখকদের নিজস্ব জীবনদর্শন এবং কাহিনির প্রেক্ষিতের পরিবর্তনে প্রতিটি গল্পই আলাদা তাৎপর্য বহন করে। যেমন মহিম বরার 'মাছ ও মানুষ' এবং নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন সিংহের 'ইলিশ মাছের স্বাদ', হোমেন বরগোহাঞির 'ভয়' এবং বিজর দান দেথার 'সমঝোতা'। মিল অমিলের পরিবর্তে এখানে বড় হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের প্রকৃতি, ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি, যৌনতা, মিথ,

ইতিহাস, বাস্তবতা। সব মিলিয়ে এক আধুনিক মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত হই আমরা। এই মহাভারতের একজন অন্তরঙ্গ কথাশিল্পী হলেন মহিম বরা। অসমিয়া গ্রামজীবনের নিম্নবিত্ত মানুষজনের সুখ-দুঃখের গল্পকার তিনি। দৈনন্দিনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের পাশাপাশি এসব মানুষজনের গভীর জীবনবোধও উঠে আসে তাঁর কাহিনিতে। অন্যদিকে পরিবর্তিত সময় ও সমাজবিষয়ে গভীর দৃষ্টি, চরিত্র নির্মাণের অদ্ভুত ক্ষমতা এবং নতুন শৈলী মিলিয়ে হোমেন বরগোহাঞি সত্যিকারের একজন আধুনিক লেখক। 'আধা লেখা দস্তবেজ'-এর লেখিকা মামনি রয়সম গোস্বামীর গল্পে উঠে এসেছে এমন এক নারীর কথা যার প্রেম গার্হস্থ্য পায় না, যার গার্হস্থ্য অন্ন-বস্ত্র পায় না এবং শেষ পর্যন্ত তাকে শরীর বেচার জন্য দরজায় এসে দাঁড়াতে হয়। তখন ব্রহ্মপুত্রের ওপর ঝুলে থাকা সূর্যটাকে মনে হয় 'এক অসহায় বেশ্যার লাল মুখ।' রোমান্টিক প্রেম, যৌনকর্মীদের জীবন থেকে রাজনৈতিক গল্প যা কিছুই লিখুন না কেন, সআদত হোসেন মণ্টোর ভেতর একজন ধ্রুপদী লেখকের মন ও মেজাজের ছাপ রয়েছে। 'টোবা টেক সিং' গল্পের প্রথম বাক্যটিই ধরা যাক— 'দেশ বিভাগের দু-তিন বছর পরে পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান সরকারের খেয়াল চাপল সাধারণ কয়েদিদের মতো পাগলদেরও বদলাবদলি করা হোক।' ঐতিহাসিক কিংবা অনৈতিহাসিক একটা সিদ্ধান্ত এমন রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক একটি বাক্যে খুব কম লেখকই গেঁথে দিতে পারেন। 'আগ কা দরিয়া' উপন্যাসের লেখক কুরর্তুল আয়েন হ্যায়দরের ছোটোগল্পের ভৌগোলিক এবং সময়ের বিস্তার অবাক করার মতো। মধ্যযুগীয় কাহিনিকথন রীতি, মনস্তাত্ত্বিক সাহিত্য বিবরণ, প্রগতি সাহিত্য ভাবনা, হিন্দুস্তানি সংগীত, শিল্পকলার পাঠ ইত্যাদি মিলেমিশে তাঁর কথাসাহিত্য হয়ে উঠেছে বিষয় ও নির্মাণে অভিনব। অন্যদিকে ওড়িয়া জনজীবনের যে অন্তরঙ্গ ছবি কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী তাঁর সংবেদী কথাগদ্যে তুলে ধরেছেন তার সমাজতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিনের কথা, যার অনেকটাই দুঃখ আর বেদনা দিয়ে গড়া, তা উঠে এসেছে নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন সিংহের লেখায়। অসম থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর গল্পের পটভূমি। সেখানকার নদী, পাহাড়, ঝর্নার সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে যায় নিম্নমধ্যবিত্ত এবং গরিব মানুষজনের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। সে কথা কুঞ্জমোহন লেখেন জল-মাটির কাছাকাছি এক গদ্যে। গল্পের চিরাচরিত কাহিনি এবং উপস্থাপনা-রীতি ভেঙে গঙ্গাধর গ্যাডগিল ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের জটিল স্তরগুলি স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন তাঁর গল্পে। যার জন্য তিনি পুরনো প্রতীকের পরিবর্তে কখনো নতুন প্রতীক নির্বাচন আবার কখনো নির্মাণ করেন। ভেঙ্কটেশ মাডগুলকারের বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিকে তার নিজস্ব নিয়মে উপলব্ধি করা। তাঁর গল্পের গাছপালা, মানুষ, পশু, পাখি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বাঁচে। প্রচলিক ছকের বাইরে হলেও তাঁর ভাষাশৈলী সরল ও সজীব। হিন্দী কথাসাহিত্যের মূল স্তম্ভ প্রেমচন্দ। কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথাকার তিনি। 'গোদান', 'গবন', 'সেবাসদন', 'কায়াকল্প', 'প্রেমাশ্রম', 'কফন' তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলির অন্যতম। এইসব লেখায় উঠে এসেছে জমিদার ও আমলাদের সমবেত উদ্যোগে কৃষকদের শোষণ, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, কু-সংস্কার, পণপ্রথা, নারী নির্যাতন,

বিধবাদের জীবন, যৌনকর্মীদের গ্লানি, সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি। হিন্দী উপন্যাস 'মৈলা আঁচল'-এর লেখক ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'-র গল্প পড়লে মনে হয় কাহিনিকথন বাইরের মানুষ নন, গল্পেরই একটি চরিত্র। গুজরাতী কথা-সাহিত্যে জাভেরচাঁদ মাঘানীই প্রথম গ্রামীণ ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশকে তুলে ধরেছেন। গ্রামজীবনের ভাষা তাঁর মুখ্য হাতিয়ার। ক্যাথলিক ধর্ম অধ্যুষিত শহরতলিতে বসবাসের জন্য দামোদর মাউজোর লেখায় আঞ্চলিক জীবনের রঙ ও রূপ ধরা পড়েছে। উঠে এসেছে গোয়ার স্থানীয় ঘটনা এবং মানুষজনের হাসি-কান্নার দৈনন্দিন জীবন। অনুভূতিশীল হৃদয়, অনুপুঙ্খ দৃষ্টি এবং রোমাণ্টিক আদর্শবাদ ধূমকেতুর বৈশিষ্ট্য। সময় ও সমাজ তাদের জটিলতা ও কুটিলতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে ধীরুবেন প্যাটেলের গল্পে। প্রসাদগুণে গল্পগুলি বেশ সুখপাঠ্য। শোষিত ও অপমানিত দলিত মানুষের কষ্টও বেদনার জীবন্ত দলিল দেবানুরু মহাদেবের গল্পগুলি। শব্দচয়ন থেকে কাহিনি বিবরণের মধ্যে তিনি সেই গদ্যকে প্রতিষ্ঠা করেন, যা চরিত্রগুলির জীবনযাপন এবং আচরণের পরিপূরক। কাহিনির স্বর নির্মাণেও তাঁর দক্ষতা অসম্ভব। অশোকমিত্রণের লেখায় রয়েছে জীবনের সত্যিকারের এক প্রতিচ্ছবি। সৎ ও গভীর সেই পাঠে মানুষের ইচ্ছে, ভয়, রাগ, সাফল্য, ব্যর্থতা, আনন্দ, দুঃখ ধরা থাকে। বিষয় এবং উপস্থাপনার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন পালগুম্নি পদ্মরাজু তাঁর গল্পগুলিতে। শৈলীও বেশ আকর্ষণীয়। সাধারণ কথার মধ্যে জীবনের গভীর স্তরকে তিনি অনায়াসে স্পর্শ করে গেছেন। মানবিকতায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের এই গল্পকার। যার ছাপ পড়েছে তাঁর গল্পগুলিতেও। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী যে বরাবরই দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অমৃতা প্রীতমের গল্পে। তিনি বিশ্বাস করেন সমাজ বদলায় না, নারীর কপাল- লিখনও না। কর্তার সিং দুগ্গল-এর কথাসাহিত্যের ভিত্তিভূমি পঞ্জাবের মাটি-জল এবং আঞ্চলিক পথহারী ভাষা তাঁর স্বরলিপি। দেশভাগ জনিত তিক্ততা, অবদমিত যৌনতা এবং নারীর অন্তরঙ্গ বিবরণ ফুটে উঠেছে তাঁর সৃজনশীল গদ্যে।

আসলে সাহিত্যে সমাজের প্রভাব থাকবেই— তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যাই হোক না কেন। আর প্রত্যেকটি সমাজইতো এক একটি নিজস্ব সংস্কৃতির বাহক। জীবনের পালাবদলের ইতিহাসে যুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা দেখে সভ্যতা সম্পর্কে সন্দীহান হয়েছেন সমকালীন প্রায় সমস্ত সাহিত্যিক। মধ্যবিত্তের সভ্যতা যেখানে ভেঙে পড়েছে খান খান হয়ে। সমাজের চারদিকে শূন্যতা, মূল্যবোধের বিনষ্টি, চারিত্রিক অধঃপতন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দুর্দশা স্বাভাবিক-ভাবেই উঠে এসেছে আলোচ্য এই গল্পগুলিতে।

৩.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গেই বলেছেন 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে/যাবে না ফিরে/এই ভারতের মহামানবের/সাগরতীরে।' 'ভারতজোড়া গল্পকথা'র পঁয়তাল্লিশটি গল্পে এভাবেই ধরা পড়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রূপ। এই সংকলনের চারটি গল্প আপনাদের পাঠ্য— (১) মহিম বরার 'মাছ ও মানুষ'

(অসমিয়া), (২) সআদত হোসেন মণ্টো-র 'টোবা টেক সিং' (ওড়িয়া), (৩) কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর 'বিজয় উৎসব' (ওড়িয়া) এবং, (৪) নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন সিংহের 'ইলিশ মাছের স্বাদ' (মণিপুরি)। তবে সৃষ্টিকে বুঝতে হলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন স্রষ্টাকে। এজন্য মূল গল্পগুলিতে প্রবেশের আগে আমরা জেনে নেব এই চারজন লেখকের জীবন, সাহিত্যকৃতি এবং তাঁদের মানসগঠন সম্পর্কে। মানুষের সুখ-দুঃখের নানা কাহিনি বুননে তাঁরা সিদ্ধহস্ত। অনায়াস চলাফেরা মনস্তত্ত্বের গভীরেও। মহিম বরার গল্পে আমরা দেখব অসমিয়া নিম্নবিত্ত মানুষজনের দৈনন্দিনের বেঁচে থাকার লড়াই। যেখানে সামান্য একটি মাছ হয়ে উঠে নিঃস্ব মানুষের প্রতীক। জীবকান্তর তাই মনে হয়, "ওরও কি উরুকা আছে?... ছেলে-মেয়ে-গাঁয়ের লোক— আত্মীয় কুটুম্ব— মাছের বউ-ছেলেও কি তার পথ চেয়ে বসে আছে বাবাসোনাদের মতো?" রাজনৈতিক নেতাদের খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের চাপে বিধ্বস্ত সাধারণ মানুষ। সআদত হোসেন মণ্টোর গল্পে আমরা দেখব দেশবিভাগের মর্মান্তিক ফলশ্রুতি। "সেই লোকটা, যে পনেরো বছর ধরে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে গেছে, সে আজ উপুড় হয়ে শুয়ে। এপারের কাঁটাতারের পেছনে পাকিস্তান। মাঝখানের জমির সেই টুকরোর ওপর, যেটার কোনো নাম ছিল না, টোবা টেক সিং সেখানে পড়েছিল।" কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহীর 'বিজয় উৎসব' গল্পটি বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা। চালের অভাবে গরিব লোকগুলি বুনো ফল খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে। কিন্তু রিক্তশ্রী পাণ্ডুর পৃথিবীতে বেড়ে চলে শুধু মৃতের সংখ্যা। শত চেষ্টা করেও মুকুন্দকে হার মানতে হয়। গল্পের শেষে আমরা দেখব যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। বিজয় উৎসব পালনে সবাই ব্যস্ত। তবে সবচেয়ে বড় করে বিজয় উৎসব পালন মুকুন্দর। কারণ, "মানুষের কাঁধে চেপে যাত্রার সৌভাগ্য তার এই প্রথম। এবং শেষ।" নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন সিংহের 'ইলিশ মাছের স্বাদ' গল্পে আমরা দেখব শ্রমজীবী মানুষের দুঃখময় দৈনন্দিনের কথা। যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় গরিব জেলে চাওবা একটি ইলিশ মাছ ধরে। তার সদ্য কথা ফোটা ছেলে মুক্তা হাত-পা নাচিয়ে পাড়াশুদ্ধ জানিয়ে আসে, "গাঙ্গরতন ধইরা আনছে আমার বাবায়, অততো বড়। তুমিতাইন খাইছনি কুনদিনই?" অথচ একমুঠো চালের জন্য স্বপ্নের মাছটি বেচে দিতে হয়। গলাফাটিয়ে মুক্তা তখন অঝোরে কাঁদছে, "বাবা, আমরার মাছ নিছেগি, আমরার মাছ নিছেগি।"

তবে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে ছোটোগল্পের সংজ্ঞা। জানা আবশ্যক ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি। আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আপনারা জানতে পারবেন—

- ছোটোগল্পের সংজ্ঞা।
- ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ।
- গল্পগুলির প্রধান এবং অপ্রধান চরিত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- গল্পগুলির বর্ণনাভঙ্গি, প্লট, ভাষা।
- গল্পগুলিতে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব।

৩.২ ছোটোগল্পের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ বিচার

সভ্যতার সূচনা থেকেই গল্প শুনছে মানবশিশু। বস্তুত মানুষের একটি পরিচয় হল, সে গল্প শুনতে ভালোবাসে। আমরা জানি গল্পের খিদে ভাতের খিদের পরেই। পৃথিবীর ইতিহাসে গল্প তাই সবচেয়ে প্রাচীন, সর্বাপেক্ষা আদৃত ও সর্বজনগৃহীত। গল্পের উৎস সন্ধানে আমরা বলতে পারি, 'দুলক্ষ বছর আগে হাইডেলবার্গের গুহায় বসে মানবশিশু তার দিদিমার কাছে গল্প শুনত' (কালের পুস্তলিকা— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়)। 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন— "মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, গল্পের জন্মও সেদিন থেকে।" শিশিরকুমার দাশ 'বাংলা ছোটগল্প' গ্রন্থে বলেছেন— "যুগে যুগে বিচিত্র গল্প সৃষ্টি হয়েছে, তারপর তারা ছড়িয়ে গেছে। আবার কোনো অনামা শিল্পী তাদের কুড়িয়ে নিয়েছে, নতুন করে সাজিয়েছে, নতুন মানুষের কাছে সেই গল্পগুচ্ছ উপহার দিয়েছে। এমনিকরে গল্পধারা আদিকাল থেকে বয়ে এসেছে।" আবার ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন— "গল্প বলার ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন। যাযাবর মানুষের মনে প্রথম যেদিন কথার অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল— সেই কথাকে যেদিন তারা প্রথম রূপ দিতে পেরেছিল ভাষার মধ্যে, মানুষের গল্প বলার আকাঙ্ক্ষা সেই আদিম দিনের।" সমালোচকরা এটা বলেন যে, গল্পের সূচনা ভারতবর্ষেই প্রথম হয়েছিল। 'জাতক' হল সেই গল্পকথার প্রথম পরিপূর্ণ নিদর্শন। তবে আধুনিক সাহিত্যে আমরা যাকে ছোটোগল্প বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি, সেটা অনেক পরের ঘটনা। সেটা পাশ্চাত্যের অবদান। সেখানে একটা প্রয়োজনের তাড়নায় ছোটোগল্প লেখার সূচনা হয়েছিল— সেটা হল, অসংখ্য সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার তাগিদ। বিশ্বসাহিত্যে ছোটোগল্প বস্তুত নতুন এক শিল্পশাখা— নতুনত্ব তার অন্তঃস্বভাবে যেমন, তেমনি তার পোষাক পরিচ্ছদেও। প্রতিটি সৃষ্টিতেই সে নতুনতর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাই একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় তাকে বর্ণনা করা অসম্ভব।

ছোটোগল্প যন্ত্রণার ফসল। জীবনের পুরনো মূল্যবোধগুলো যখন অর্থহীন মনে হতে থাকে, ব্যক্তি চেতনার সঙ্গে, সমাজ চেতনার সঙ্গে কোনোমতেই সামঞ্জস্য ঘটতে চায় না— যখন প্রতিমুহূর্তে চারপাশের সঙ্গে শিল্পীর সংঘাত, তখনই হয় গল্পের জন্ম। জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়েই ছোটোগল্পের আবির্ভাব। তারপর সেটা বিশিষ্ট একটি 'শিল্প নির্মাণে' পরিণত হয়েছে। সেটা উনিশ শতক। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত পরিসর, একটি মাত্র ভাব একটি সংকটের সৃষ্টি করে পাঠককে তৃপ্ত করার সংবাদপত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও গল্প রচনা শুরু হয়েছিল এই শতকেই। সংবাদপত্রের পাঠককে চমকিত করে তুলতে গল্পের উপসংহারেও এসেছিল নানা বৈচিত্র্য। তাই উনিশ শতকেই আরম্ভ হয়েছিল ছোটোগল্পের সংজ্ঞা নির্মাণের কাজ।

ইংরেজ গল্পলেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসন গ্রাহাম বনফ্যুরকে বলেছিলেন— "There are, so far as I know, three ways, and three ways only, of writting a story.

You may take a plot and fit characters to it, or you may take a character and choose incidents and situations to develop it, or lastly you may take certain atmosphere, and great actions and persons to realise it" (Life of Stevenson–Balfour)— এখান থেকে আমরা প্লটপ্রধান, চরিত্রপ্রধান, প্রতীতি বা ইম্প্রেসনমুখ্য— এই তিনি শ্রেণির গল্পের ইঙ্গিত পাই। এডগার এলান পো প্রতীতিমুখ্য গল্পকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন 'Story of effect'। বস্তুত ছোটোগল্পের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা পো-ই প্রথম করেছিলেন। ন্যাথানিয়েল হথর্নের গল্প সংকলন 'Twice Told Tales'-এর সমালোচনায় গ্রাহামস ম্যাগাজিনে তিনি লিখেন— "We allude to the short prose narrative, requiring from a half-hours to one or two hours in its persual...its immense force derivable from totality... A skilfull literary artist has constructed a tale... with certain unique or simple effect... The idea of tale has been presented unblemished, because undisturbed... under length is yet more to be avoided." (A. E. Poe, 1842) পো-র পরে ছোটোগল্পের যুক্তিগ্রাহ্য একটি সংজ্ঞা দেন ব্রাণ্ডার ম্যাথুজ— "The short story fulfills the three unities of the French classical drama; it shows one action, in one place, on one day. A short story deals with a single character, a single event, a single emotion, or the series of emotions called forth by a single situation." (Philosophy of the short story, 1885) তিনি 'Unity of impression'-এর কথাও বলেছেন যা ছোটোগল্পের একটি অন্যতম লক্ষণ। এছাড়াও আরও কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ আমরা এখানে করব। যেমন—

(১) ওয়েবস্টার ডিক্সনারি : "A short story usually presenting the crisis of a single problem."

(২) সিয়ান ও'কাওলেন : "...the short story is an emphatically personal exposition." (The short story)

(৩) আরান রীড : "...the story typically centres on the inward meaning of a crucial event, on sudden momentous intutions." (The short story)

(৪) হাডসন : "A short story must contain one and only one informing idea, and that this idea must be worked out its logical conclusion with absolute singleness of method." (An Introduction to the study of Literature)

(৫) হাবার্ট গোল্ড : "The story taller must have a story to tell, not merely some sweet prose to take out for a walk." (Kenion Review– International Symposium on the short story, 1968)

বাংলা ভাষায় ছোটোগল্পের সংজ্ঞা নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে। ছোটোগল্পের সংজ্ঞা প্রথম যে বাঙালি আমাদের দিয়েছিলেন, তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। তিনি বলেছেন— "কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোটোগল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনা বর্ণনার চেষ্টা করে।" ১৯১৮ সালে প্রমথ চৌধুরী লিখলেন— "ছোটোগল্প প্রথমত ছোটো হওয়া চাই, তারপরে তা গল্প হওয়া চাই" (ছোটোগল্প)। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বাংলা ছোটগল্প' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন— "ছোটোগল্পের উদ্দেশ্য জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা, মনের একটি স্বতন্ত্র ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে স্বাভাবিক পরিণতি সংঘটন সাধন।" তাছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতাটিকেও ছোটোগল্পের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা মেনে নিতে পারি—

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
.....
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

তবে ছোটোগল্পের সমস্ত সংজ্ঞার মধ্যে এখনও পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য বলে আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সজ্ঞাকে মেনে নিতে পারি — "ছোটোগল্প হচ্ছে প্রতীতি (impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনি যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।" (সাহিত্যে ছোটোগল্প, ১৯৫৬)

আত্ম-সমীক্ষামূলক প্রশ্ন

ছোটোগল্পের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে এর লক্ষণগুলো সম্পর্কে আপনার ধারণা স্পষ্ট করুন। (ন্যূনাধিক ১০০ শব্দের মধ্যে)

.....

.....

.....

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সমকালীন সমাজের সঙ্গে গল্পের কিছুটা হলেও সম্পর্ক থাকতে হবে। লেখকের কল্পনাশক্তির সঙ্গে একাত্মতা থাকবে গল্পের। তবে ছোট্ট এই পরিসরে ছোটোগল্পের সমস্ত সংজ্ঞা আলোচনা করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় সবকয়টি লক্ষণকেও একত্রে নিয়ে। তবুও আমরা চেষ্টা করব ছোটোগল্পের আবশ্যিক লক্ষণগুলিকে তুলে ধরতে—

(১) ছোটোগল্প অবশ্যই 'single impression' অর্থাৎ একক প্রতীতির উদ্ভাসন ব্যঞ্জনাকে ধারণা করবে।

(২) সেই একক প্রতীতি ব্যক্তিমনের নিজস্ব অনুভূতিকে ব্যক্ত করবে।

(৩) একটা ঘটনা ছোটোগল্পে থাকবেই। এবং তাকে হতে হবে অবশ্যই গতিশীল।

(৪) ছোটোগল্পের আখ্যানে বাস্তব-রস থাকা চাই। রূপকধর্মী হলেও তা হবে বাস্তবের রূপক।

(৫) বাহুল্য বর্জিত হবে সবদিক দিয়ে।

(৬) চরিত্রের সংখ্যা কম হবে।

(৭) পরিণামের দিকে ঋজুতিতে এগিয়ে যাবে।

এবারে আমরা আলোচনা করব একটি গল্পকে বিশ্লেষণ করার জন্য কী কী প্রস্তুতি নেওয়া উচিত—

(ক) প্রথমেই গল্পের শ্রেণি নির্ণয় করতে হবে।

(খ) তারপরে বিচার্য বিষয় ঘটনাধারা এবং চরিত্র।

(গ) ভাবের একমুখিনতা কতটুকু রক্ষা করা হয়েছে এবং চরিত্র সেই ভাবের উপোযোগী কি না।

(ঘ) চতুর্থ বিচার্য, গল্পটিতে Climax আছে কি নেই।

(ঙ) গল্পের শিল্পরীতি।

(চ) লেখকের জীবনদর্শন গল্পে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে।

(ছ) গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা।

(জ) নামকরণের যৌক্তিকতা।

নামকরণের বিচার যখন আপনারা করবেন তখন বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ— এই দুদিক থেকেই তাকে বিচার বিশ্লেষণ করবেন। বাইরের দিক থেকে ঘটনাপ্রবাহে নামকরণের উপযুক্ত কোনো প্রসঙ্গ এসেছে কি না— সেটা যেমন দেখতে হবে তেমনি আভ্যন্তরীণ বিচারে বা রসবোধে নামকরণোদ্ধৃত ভাব ব্যক্ত হয়েছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। তবেই তার সার্থকতা বিচার সম্ভব।

লক্ষণীয় প্রসঙ্গ

ছোটোগল্পের প্রসঙ্গে তার পূর্বসূরী 'Fable' আর 'Tale'-এর কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। 'Tale' আখ্যায়িকা, 'Fable' কথা। আখ্যায়িকা ব্যপ্ত, বিস্তীর্ণ বহলতায় পৃথুল। কথা সংক্ষিপ্ত একমুখী। আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল বৃত্তান্ত বা 'Anecdote'। 'Tale' উপন্যাসেরই সংক্ষিপ্ত রূপ, তা গল্প নয়। বৃত্তান্তের শেষে থাকে একটা স্পষ্ট পূর্ণ যতি। বৃত্তান্ত পাঠের শেষে পাঠকের মনে নতুন কোনো সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয় না। বৃত্তান্তের শেষে থাকে একটা স্পষ্ট পূর্ণ যতি। বৃত্তান্ত পাঠের শেষে পাঠকের মনে নতুন কোনো সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হয় না। বৃত্তান্তে যতক্ষণ মানব-চরিত্র বা জীবনতত্ত্বের উপর কোনো আলোকপাত না ঘটছে, ব্যঞ্জনার প্রকাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে ছোটোগল্প বলা যাবে না।

৩.৩ ভারতজোড়া গল্প কথা : নির্বাচিত গল্পের আলোচনা

শুধু বাঙালি কেন গোটা ভারতীয় জীবনেই দেশভাগ এমন এক দাগ, যা সহজে মুছে যাওয়ার নয়। সেই সঙ্গে তার অবস্থানটিরও খোঁজ, সেই অনন্ত খোঁজ, তাকে জীবনে কষ্ট দেয়, অস্থির করে। সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ, তাই অবধারিতভাবে এই প্রসঙ্গগুলি এখানে এসে পড়ে। সআদত হোসেন মণ্টোর গল্পগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। বিবেকের দায়শোধের বোধ তাঁর গল্পের মূল উৎস। সময় নিয়ত পরিবর্তনশীল। জীবন পালটায়। পালটায় তার যাপনও। মাত্র ৪৩ বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তুলে এনেছেন গল্পের কাহিনি ও চরিত্র, চরিত্রের সংলাপ ও শৈলী। তেতাল্লিশের মন্বন্তর, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশভাগ তাঁর গল্পে তৈরি করেছে এক স্বতন্ত্র চেতনার ভিত। ভারতবর্ষ— অবিভক্ত বাংলাদেশের মানুষ তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোষণ-বঞ্চনা, ইচ্ছে-অনিচ্ছে, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, আবেগের মিশেল মণ্টোর গল্পে এনেছে অন্য মাত্রা। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই শিল্পিত অনুভব ও সংযত আবেগকে বাদ দিয়ে নিছক রাজনীতির গল্প তিনি লেখেননি। বোহেমিয়ান তাঁর জীবনের মতোই মণ্টোর গল্পে আছে নানা বৈচিত্র্যের সমাহার। এই উপমহাদেশের নানা চরিত্র ও নানা বর্ণের মানুষ, নানা, ধরনের ভৌগোলিক সীমানা, নদ-নদী, পাহাড়-জঙ্গল, বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিচিত্র সব মানুষ উঠে এসেছে তাঁর রচনায়। সামরিক দুঃশাসন, ব্যক্তি লালসার রাজনীতি, ঔপনিবেশিক লোভ, আধাসামন্ত তান্ত্রিক উত্তরাধিকার, ধর্মীয় উন্মাদনার বিরুদ্ধে গল্পকে কীভাবে আগ্নেয়াস্ত্র করে তুলতে হয় সে মন্ত্র তাঁর জানা। আর সেইজন্যই ঐতিহাসিক কিংবা অনৈতিহাসিক একটা সিদ্ধান্তকে একটি বাক্যে গেঁথে দিতে পারেন তিনি— "দেশবিভাগের দু-তিন বছর পরে, পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান সরকারের খেয়াল চাপল সাধারণ কয়েদিদের মতো পাগলদেরও বদলাবদলি করা হোক।"

একটি পাগলাগারদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'টোবা টেক সিং' গল্পটি। যে পাগলাগারদে রয়েছে ভারত-পাকিস্তান উভয় দেশের কয়েদিরা। উপরতলার লোকেদের ফয়সালা অনুযায়ী এখানে-ওখানে উঁচু স্তরে কনফারেন্স হল আর শেষমেষ একদিন

পাগলদের পালটাপালটির দিনক্ষণ ধার্য করা হয়ে গেল। খুব ভালো করে বাছাবাছি করা হল। যে সমস্ত মুসলমান পাগলদের অভিভাবক হিন্দুস্তানে ছিল তাদের সেখানেই রেখে দেওয়া হল। আর যারা বাকি রইল, তাদের সীমাপারে রওনা করিয়ে দেওয়া হল। যেহেতু প্রায় সব হিন্দু-শিখই চলে গিয়েছিল, তাই পাকিস্তানে কাউকে রাখারাখির প্রশ্নই উঠল না। লাহোরের পাগলাগারদে এমনই একটি পাগল বিশন সিং। তার মাথার চুল খুব পাতলা। যেহেতু সে খুব কম স্নান করত, দাড়ি আর চুল মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে যে ওর মুখের চেহারা ভয়ানক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোকটা কারো ক্ষতি করত না। পনেরো বছরের জেল জীবনে কারো সঙ্গে সে ঝগড়া করেনি। জানা যায় টোবা টেক সিং -এ ওর অনেক জমিজিরেত ছিল। একসময়ের সম্পন্ন জমিদার বিশন সিং -এর মাথাটা হঠাৎ বিগড়ে যায়। ওর আত্মীয়স্বজন লোহার মোটা মোটা শেকলে বেঁধে নিয়ে এসে ওকে পাগলাগারদে ভর্তি করে দেয়। প্রতি মাসে কেমন করে যেন ও নিজে নিজেই বুঝে যেত কোন দিন ওর স্বজন দেখা করতে আসবে। সেই দিন সে খুব ভালো করে সাবান ঘষে স্নান করত। পরিপাটি করে পোষাক পরত। পাকিস্তান আর হিন্দুস্তানের ঝামেলা যে দিন থেকে শুরু হল, সেদিন থেকে তার সঙ্গে আর কেউ দেখা করতে আসত না। বিশন সিং -এর খুব ইচ্ছে করত নিজের মেয়েকে দেখতে। ইচ্ছে হতো, ওর জন্য ফল মিষ্টি, কাপড়-টাপড় যারা আনত, তারা আসুক। কারণ সে বিশ্বাস করত, তারা টোবা টেক সিং থেকেই আসে, যেখানে ওর জমিজমা আছে। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না যে নিজে কোথায় আছে— হিন্দুস্তান না পাকিস্তানে? যদি হিন্দুস্তানে থাকে তাহলে পাকিস্তান কোথায়? আর যদি পাকিস্তানেই থাকে তবে এটা কী করে সম্ভব যে কিছুকাল আগেও তারা হিন্দুস্তানেই ছিল।

এদিকে বদলির প্রস্তুতি পুরোদমে চলছিল। তারিখও ঠিক হয়ে গেছে। এধার থেকে ওধার আর ওধার থেকে এধার আসার পাগলদের তালিকা এসে পৌঁছানোর পর লাহোরের পাগলাগারদ থেকে হিন্দু-শিখ পাগলে ভরা ট্রাক পুলিশ ফৌজের সঙ্গে রওয়ানা হয়। ওয়াগার বর্ডারে দু-দিকের সুপারিনটেণ্ডেট একে অন্যের সঙ্গে দেখা করে প্রারম্ভিক কাজকর্ম শেষ করলেন। সারারাত ধরে চলতে লাগল এই অদল বদলের পালা। পাগলদের সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ছিল। তারা এদিক সেদিক পালাচ্ছিল, কেউ গাল দিচ্ছিল। কেউ গান গাইছিল। উলঙ্গও হয়ে পড়ছিল কেউ কেউ। ঝালাপালা অবস্থা। তার উপর এত মারাত্মক ঠাণ্ডা পড়েছিল যে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল।

কেন তাদের নিজের জায়গা থেকে উপড়ে ফেলা হচ্ছে এটা মাথায় ঢুকছিল না বলে বেশিরভাগ পাগলই এই অদল-বদলের ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারছিল না। যখন বিশন সিংয়ের পালা এল, তখন সে প্রশ্ন করল, 'টোবা টেক সিংটা কোথায়? পাকিস্তানে না হিন্দুস্তানে?" অফিসার যখন জানালেন পাকিস্তানে, বিশন সিং তখন লাফিয়ে সেখান থেকে সরে দাঁড়াল। দৌড়ে নিজের অবশিষ্ট পড়ে থাকা সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে গেল। ওকে অনেক বোঝানো হল যে টোবা টেক সিং এখন হিন্দুস্তানে চলে গেছে— যদি ও না-ও যায় তাহলেও শিগগিরই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ও কোনো

কথা শুনল না। দু-সীমার মাঝামাঝি একটা জায়গার নিজের ফোলা পা নিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন কোনো ক্ষমতাই ওকে নড়াতে পারবে না। যেহেতু লোকটা মানসিকভাবে সুস্থ ছিল না, তাই ওর সঙ্গে জোরাজুরি করা হল না। ওকে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়ে বাজি কাজ যথারীতি চলতে লাগল। ঠিক সূর্য ওঠার প্রাক্‌মুহূর্তে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকা বিশন সিং গগনভেদী চিৎকার করে উঠল। কয়েকজন অফিসার এদিন ওদিক থেকে দৌড়ে এলেন। দেখা গেল, সেই লোকটা, যে পনেরো বছর ধরে নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে গেছে, সে আজ উপুড় হয়ে শুয়ে। এপারের কাঁটাতারের পেছনে পাকিস্তান। মাঝখানের জমির সেই টুকরোর ওপর, যেটার কোনো নাম নেই, আমরা যাকে বলতে পারি no man's land, টোবা টেক সিং সেখানে পড়েছিল।

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর 'বিজয় উৎসব' গল্পের ভারতবর্ষ রিক্ত, মৃত্যুপাণ্ডুর। যেখানে শুধু অন্নই নয়, দেখা দিয়েছে কাপড়ের জন্যেও হাহাকার। কেরোসিনের অভাবে অন্ধকারে ডুবে থাকে গ্রাম। অভুক্ত, অর্ধনগ্ন মানুষেরা অসহায়। তাছাড়াও অদ্ভুত এক রোগ ছড়িয়ে পড়েছে সারা গ্রামে। প্রথমে হাড়গোড় ফুলে যায়। তারপর সব শেষ। গল্পের নায়ক মুকুন্দের মাও চলে গেছে। তার আগে আটদিনের এদিক-ওদিকে মারা গেছে ছোটো ভাই দুটি। দু-মাস ধরে শয্যাশায়ী তার বাবা গুণ পরিডা। আর রয়েছে ছোটোবোন মানিক। তার মুখ দিয়ে কোনো কথাই প্রায় বেরোয় না। কে বলবে চোদ্দো পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়েছে। দেখে দশ-এগারোর বেশি মনে হয় না। খালি হাড় ক'খানা জিরজির করছে। বড়োবোন উমার কথা কিছুতেই মনে করতে চায় না মুকুন্দ। বছর দুয়েক আগে যখন সরকার ও রাজনৈতিক নেতারা ওড়িশাকে 'উদ্বৃত্ত' প্রদেশ ঘোষণা করে ধান বাইরে রপ্তানি করতে লাগলেন, তখন থেকে ছেলেপুলেকে বাঁচাতে জমি বিক্রি করে ধান কেনা শুরু গুণ পরিডার। ক্রমে আকাল আসে। তখন উমার স্বামী দানেই সোঁয়াই স্ত্রী পুত্রকে ভাসিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেপাত্তা হয়ে যায়। ছোটো দুটি ছেলেকে অন্নসত্রে ছেড়ে পেটের দায়ে উমা গিয়ে উঠে 'হাড়ির ঘরে'। পাঁচজনে পাঁচরকম কথা বলে তার সম্পর্কে। সে-সব শতগুণ হয়ে বাজে গুণ পরিডার বুকে।

মুকুন্দর তবু মন মানে না। তার মনে হয়, ঠিকমতো ঔষধ পড়লে তার মা-ভাইরা হয়তো মারা যেত না। কিন্তু সে সময় ফুটো পয়সাটিও ছিল না তার হাতে। ধারধোর করে যাও-বা জুটিয়েছিল তাতে পথ্যি জোগাতেই টানাটানি। মুকুন্দর তাই জেদ ধরে গেছে, যেভাবেই হোক বাবাকে সে বাঁচাবেই। নিউছুনা গাঁয়ের বদ্যি নিধি মেকাপকে কষ্ট করে আট আনা দিয়ে পাঁচন নিয়ে আসে। কিন্তু মুশকিল হল পথ্য নিয়ে। সেটা তৈরি করতে হবে পুরনো চাল দিয়ে। এদিকে গাঁয়ের লোকগুলি চাল দেখেইনি অনেক দিন। যুদ্ধের বাজারে চাল, কেরোসিন সবই স্বপ্ন। পেটের দায়ে এই গরিব লোকগুলি ধানগাছের মতো লম্বা লম্বা ঘাসের ডগায় যে বুনো ফল ধরে, তা-ই সেদ্ধ করে খায়। একে এরা বলে শ্যামাচাল। তাই বলে যে সে গাঁয়ে যে অবস্থাপন্ন লোক একটিও ছিল না তা কিন্তু নয়। জেনাদের বাড়ি দু-বেলা উনোন জ্বলে। ও বাড়িতে সবাই নিত্যদিন মণ্ডামিঠাই খায়। কারো বিপদে ওরা সাহায্য করে না। কিছু চাইতে গেলে সোজা না করে দেয়। নুয়াপাড়ার

বাঞ্ছাসাহু— যার কাছে মুকুন্দ কাজ করে, সেখানেও অনেক ধার করে ফেলেছে মুকুন্দ। নতুন করে আবার কিছু চাওয়ার মতো সাহস তার হল না। সেই তাই ঠিক করে দু-ক্রোশ দূরে মণিজঙ্ঘার সাধু পাণ্ডার দোকান থেকে বাবার জন্য পুরনো চাল নিয়ে আসবে।

এদিকে মানিক রোজ সকালে বাঁশের চুবড়িটা নিয়ে শ্যামাচাল ঝাড়তে যায়। তার সামনে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে শ্যামাচাল ঝাড়ে পাল পাল মেয়ে-মরদ। যে যত আগে যায় তার ভাগ্যে তত বেশি চাল। পৌষ মাসে যা ফসল ওঠে তাতে সরকারের খাজনা মেটাতেই অর্ধেকের বেশি চলে যায়। বাকি যা থাকে তা দিয়ে কাপড়-চোপড় আর সংসারের জন্য খুব একটা হাতে কিছু থাকে না। কলমি কি সজনে, কচু বা শামুক-গুগলি যা পায় তা-ই দিয়ে পেট চালায়। শ্রাবণ ভাদ্রে সকলের ভাঁড়ার শূন্য। তখন একমাত্র ভরসা এই শ্যামাচাল। রাত পোহাতে না পোহাতে স্ত্রীপুরুষের ঢল নামে চাল ঝাড়তে। তলা থেকে সমানে ওঠা জলবিন্দুর চাদরে তারা ঢাকা পড়ে যায়। যেন কুয়াশার ভেতর দিয়ে তাদের দেহের এক-এক অংশ হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে। কারো হাত আছে তো মাথা নেই। এপাশ থেকে ওপাশ শ'য়ে শ'য়ে বাঁশের চুবড়ি বন্ বন্ করে যেন শূন্যে ভেসে ভেসে ঘুরছে। মনে হয় চুবড়িগুলো দোল খাচ্ছে কুয়াশার মধ্যে। স্ত্রী-পুরুষ কেউ কোথাও নেই। এই শ্যামাচাল ঝাড়তে ঝাড়তেই মানিক একটিই স্বপ্ন দেখে রোজ— একমুঠো গরম ভাতের।

মণিজঙ্ঘার সাধু পাণ্ডার দোকান থেকে পুরনো চাল নিয়ে বাড়ি আসার পথে মুকুন্দকে নদী পার হতে হয়। পাঁকের মধ্যে হেঁটে হাঁটু পর্যন্ত তার কাদা। গাঁয়ের মুখে পুকুরটার পাড়ে নেমে যখন মাত্র সে হাত-পা ধুতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই তার প্রতিবেশী ঘনিয়া যাকে রজ উৎসবে হাডুডু খেলায় সে হারিয়েছিল, তাকে ডাক দিল, "সাফসুতরো পরে হবি, বাপ যে এদিকে যায় যায়।" পড়িমরি করে বাড়িতে ছুটে আসে মুকুন্দ। কিন্তু তার পূর্বেই মারা গেছে গুণ পরিডা। পথ্যের চালেই শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। একটাকায় যতটুকু করা যায়, ব্রাহ্মণ ডেকে ততটুকুই করা হল। মুকুন্দর এবার শুধু একটাই চিন্তা— ছোটোবোনটাকে কীভাবে বাঁচানো যায়! শুধু দুটো শুকনো চিঁড়ে ভাজা চিবিয়ে মানিক কতদিন থাকবে। হাতের অবশিষ্ট একটি টাকা নিয়ে মুকুন্দ আবার রওয়ানা হয় মণিজঙ্ঘার সাধু পাণ্ডার দোকানে। পথে গাঁয়ের শ্মশান আসে। সামনে রাস্তায় শুধু মানুষের হাড় আর হাড়। এতটুকু জায়গা খালি নেই। এই হাড়ের গাদার মধ্যে কোনো-কোনোটা নিশ্চয়ই তার বাবা-মা-ভাইয়ের। ধড় থেকে আলাদা হয়ে গড়াচ্ছে কত মাথা। চোখ, নাকের বদলে একটা করে খালি গর্ত। ঠোঁট, নখ, দু-পাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ে কী ভয়ানক দেখাচ্ছে। পাঁজরের খাঁচার মধ্যে পেট নাড়িভুঁড়ি কিছু নেই। এক টাকার ধান কিনে মণিজঙ্ঘা থেকে ফেরার পথে মুকুন্দ দেখল বেলা পড়ে এসেছে। কয়েকদিন অভুক্ত থাকার ফলে তার পেটটা গুলিয়ে কেমন গা বমি বমি লাগছিল। চার পা চলে, একটু থামে, আবার চলে। মাজে মাঝে মেঘকাটা রোদ পড়ে ঝাঁ ঝাঁ করছে মাথার তালু। ডোবা থেকে এক আঁজলা জল খেতে খেতে মুকুন্দ স্বপ্ন দেখে, "কাল সকালে উঠে মানিক একবেলা গরম গরম

ভাত রাঁধবে।" জল খেয়ে মুকুন্দ আর সামলাতে পারে না। গলগল করে সব বমি। খানিক্ষণ আলের ওপর ধানের বোঁচকাটা রেখে নিচু হয়ে থাকে। আবার মাথা তুলে ধীরে ধীরে এগোয়। এখান থেকে গাঁ একডাকের পথ। ধানক্ষেতের আলের ওপর উঠতে যায়। একটা পা ওপরে তোলে। অন্য পা-টা আর তুলতে পারল না। বোঁচকাটা মাথা থেকে পড়ে যায়। মুকুন্দও। ক্ষেত থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে খেলে যায় তার গায়ে-মাথায়। একটুকরো মেঘ ভেসে আসে। বৃষ্টি পড়ে টুপটাপ। মুকুন্দর সারাদিনের পথচলা শেষ হয়ে গেল সেখানে।

আর সেদিনই গাঁয়ের চৌকিদার খবর নিয়ে এলো, যুদ্ধে জাপানের হার হয়েছে। সবাই যেন দরজায় আমপাতা ঝুলিয়ে বিজয় উৎসব পালন করে। থানাতে আগামীকাল স্কুলের ছেলেমেয়েদের মিষ্টি বিলোনো হবে। তবে সবচেয়ে বড় করে বিজয় উৎসব পালন মুকুন্দর। মানুষের কাঁধে চেপে যাত্রার সৌভাগ্য তার এই প্রথম এবং শেষ।

নোংথোম্বম কুঞ্জমোহন সিংহের 'ইলিশ মাছের স্বাদ' একটি অনবদ্য ছোটোগল্প। সাধারণ এক জেলে, যার নাম চাওবা গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। বরাকের জলে মাছ ধরে কোনোমতে সে সংসার চালায়, মণি, মুক্তা, তম্ফা— তিন ছেলে মেয়ে আর বছরভর অসুখে ভোগা স্ত্রীকে নিয়ে তার কষ্টের সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সংসারে স্ত্রীর অসুস্থতার চাওবা যেমন হতাশ তেমনই বিরক্ত, "আর পারিয়ার না। মরবার অইলে মরি যাওগি, কত আর মাইনষেরে জ্বালাইবায়?" যদিও মাছের মরশুমে এই চাওবাই কিন্তু স্বপ্ন দেখে অনেক অনেক মাছ ধরার। চাল ডাল কিনতে বেশিরভাগ মাছই বেচে দিতে হয়। নিজেদের বরাতে প্রায় কিছুই থাকে না। তার খুব ইচ্ছে করে তার মেয়ে সামা যে মা হতে চলেছে, তাকে ইলিশ মাছ দিয়ে একবেলা ভাত খাওয়ায়। এই ইচ্ছে বুকে নিয়ে ভোর না হতে চাওবা মণির সঙ্গে রোজ মাছ ধরতে যায়। বৈঠা হাতে ছেলেকে একটু ঝিমুতে দেখলে সে খেঁকিয়ে ওঠে, "অ্যাই মণি, সূর্য উঠি যায় আর তুমি এখনো বইয়া ঝিমাইরার চউখে মরিচর গুঁড়া লাগাই দিতামনি। জলদি পানিত মুখ ধুইয়া লও। যদিও ছেলে মেয়েকে মায়া সে ভীষণ করে। তাই দেখি ধমক দেওয়ার পরমুহূর্তেই কুর্তার বাম পকেট থেকে একটা বিড়ি আর দেশলাই বের করে ছেলের দিকে বাড়িয়ে দেয়। বলে, "এই লও, একখান বিড়িই আছিল। লও ধর। দুই একটান দিয়া আমারে দিও।"

লঙ্গর বাবার ডহরের দিকে নৌকা চালায় বাপ-ছেলে। এ জায়গা সম্পর্কে অনেকের মনেই একটা ভীতির ভাব কাজ করে। কিন্তু মাছ প্রচুর। জল একটু বাড়লেই শুশুকে ভরে যায় জায়গাটা। মাঝে মাঝে ঘড়িয়ালও দেখা যায়। গত বছর এমন সময়েই গুলি করে একটা ঘড়িয়াল মারা হয়েছিল। জালে একটু টান পড়তেই বাবা তাড়াতাড়ি টেনে তোলে জাল। জালে কিছুই ছিল না। দু-তিনবার জাল টেনে ব্যর্থ হয়ে বাপ-ছেলে আরো দক্ষিণে নৌকা চালায়। ইতিমধ্যে পাঁচ-ছ'টা নৌকা পড়েছে নদীতে। দিনের আলোও ক্রমশ ফুটে উঠেছে। কিছুদূর যেতেই নাউরেমদের ঘাটে এসে কপাল খুলল। ধবধবে সাদা, বেশ বড়সড় একটা ইলিশ জালে ধরা পড়ল। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওদের চোখমুখ। মণি দারুণ

খুশি, "ইস্, কী সুন্দর! খুউব মজা লাগবে, না বাবা?" সাবধানী চাওবা ছেলেকে সতর্ক করে, "অ্যাই চুপ, ইলান কইতো পারে না।" ঠিক তখনই নাউরেমদের ঘাড় মোটা কিপটে বুড়োটা হাক লাগায়, "কয়টা ধরলায়রে বা? আমারে একখান দিয়া যাইও। আইজকাইল পাকিস্তান থেকে ইলান মাছও আর আয় না। মাছ না খাইতে খাইতে জিবরাত লোম উঠি গেছে।" মেজাজটা বিগড়ে যায় চাওবার। যোগ দেয় মণিও, "বুড়াটারে একদম দেখতাম পারি না আমিও। হেইদিন তাঁর পুয়া তমালে মারছে আমারে।" কিন্তু চাওবা আগেই ঠিক করে রেখেছিল এবার ইলিশ মাছ পেলে বেচবে না। এদিকে বাপ-ছেলে যখন বরাক থেকে ফিরে এল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। মেয়ে তম্ফার বানানো দুধ ছাড়া গুড়ের চা বারান্দায় বসে আয়েশ করে খাচ্ছে চাওবা। বাড়িতে আজ সবার মন ফুরফুরে। সবচেয়ে বেশি আনন্দ মুক্তার। সে তার খেলার সঙ্গী তোমচৌকে হা-পা নাচিয়ে খুশির চোটে বলে, "হুনছনি আইজ তো আমরা ইলিশ মাছ খাইমু। গাঙ্গরতন ধইরা আনছে আমার বাবায়, অততো বড়। তুমিতাইন খাইছনি কুনদিন?" এরকম একটা চনমনে পরিবেশে তম্ফা কিন্তু বিষণ্ণ। বাবাকে সে জানায়, "বাবা, অখন রানবার চাউলও তো নাই, কিতা করা যায় বাবা?" কথাটো শুনামাত্রই চাওবার সারা শরীর জ্বলে যায়। ক্রুদ্ধ চোখে তাকায় মেয়ের দিকে, যেন ভস্ম করে দেবে। তামাকের নেশা কেটে যায়। ইচ্ছ হয়, সব ভেঙেচুরে ফেলে দেয়। আর ঠিক সে সময়েই কোনদিক থেকে যেন বেরিয়ে এসে উঠোনের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকে রোয়া উঠা একটা বুড়ো কুকুর। সব রাগ গিয়ে পড়ে ওই নিরাপরাধ কুকুরটির ওপর। কোনো কিছু না ভেবেই বসার পিঁড়িটি ছুঁড়ে মারে। নিরপরাধ বলেই হয়তো গায়ে লাগে না। ঘেউ ঘেউ করতে করতে বাইরে পালয়ে যায়। রাগে গরগর করতে করতে চাওবা দেখে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে পড়শি খানিনজাউ। চাওবাকে সে বলে, "আমরার থাবলৈ নাইওরে আইছে। কিন্তু একটা মাছও খুইজা পাইলাম না। হেসে হুনলাম তুমি কয়টা ইলিশা ধরছো, এর লগি আইলাম।" চাওবার হাতে একটা টাকাও ছিল না চাল কিনার। অভুক্ত ছেলেমেয়ের মুখে দুটো ভাত তুলে দেওয়ার জন্য বাধ্য হয় চাওবা ইলিশ মাছটা বেচে দিতে। মাছ হাতে নিয়ে থানিনজাউ বেরিয়ে আছে। সে যখন উঠোনে এসে পৌঁছে, হঠাৎ মুক্তার চোখ যায় মাছটির ওপর। বিস্মিত ছেলেটি জোরে চিৎকার দিয়ে ডাক দেয় বাবাকে, "বাবা, আমরার মাছ নিছেগি, আমরার মাছ নিছেগি।" হঠাৎ থানিনজাউ ভ্যাবাচ্যাকা খায়। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠাট্টার ছলেই ছেলেটিকে ধমক দেয়, "মাগনা নিরামনা, পয়সা দিমু তো।" কী বলবে বুঝে উঠতে পারে না ছেলেটি। নির্বাক বিস্ময়ে স্থির তাকিয়ে থাকে নিয়ে যাওয়া মাছটির দিকে।

৩.৪ ভারতজোড়া গল্পকথা : নির্বাচিত গল্পের নামকরণ ও চরিত্র-বিচার

এবার আমরা 'মাছ ও মানুষ', 'টোবা টেক সিং', 'বিজয় উৎসব' ও 'ইলিশ মাছের স্বাদ' গল্পেগুলির নামকরণের সার্থকতা ও চরিত্র-বিচার নিয়ে আলোচনা করব।

৩.৪.১ মাছ ও মানুষ

নামকরণ : গল্প, উপন্যাস বা নাটক যাই হোক না কেন, নামকরণের একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই। একটি গল্প বা উপন্যাসের মূল কথাটি কিন্তু প্রথমে পরিস্ফুট হয় নামকরণের মধ্য দিয়েই। কখনো কখনো জীবন ও জগৎ সম্পর্কে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে নামকরণের হাত ধরেই। চরিত্রসৃষ্টির বিশেষ ভাবাদর্শও ব্যঞ্জিত হয় নামকরণের মধ্যে। তাই নামকরণের দিকটিকে আমরা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারি না। মহিম বরার 'মাছ ও মানুষ' গল্পের নামকরণও এর ব্যতিক্রম নয়। মানুষ জীবকান্ত ও বিশাল রুই বা কাতলা মাছ— উভয়েই কিন্তু গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র। গল্পে দেখি, ভোগালি বিহুকে সামনে রেখে জীবকান্ত ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা স্থির করে মহখুঁটি বিলে যাওয়ার। পৌষ মাসের শীতে ওরা জীবনপণ করে মাছ ধরে। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত জীবকান্ত মাছটাকে ধরার আশায় মাঝদরিয়ায় চলে আসে। সম্বিত ফিরে পেয়ে সে বুঝতে পারে তার শরীরে আর একফোঁটা শক্তি অবশিষ্ট নেই। এখন মাছ, পোলো, সব ছেড়ে দিলেও সাঁতরে পাড়ে পৌঁছানো তার পক্ষে অসম্ভব। তার মনে পড়ে জ্যোতিষীর সতর্কবাণী, "জলের থেকে বিপদ আছে," ওরে ভীষণ ইচ্ছে করে ছেলে আর বউকে শেষবারের মতো দেখার। আর ঠিক তখনই মাছটা তাকে পাড়ের দিকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করে। যেখানে জীবকান্তর জন্য অপেক্ষা করে আছে মাটির নিরাপদ আশ্রয়। জীবকান্তও চেষ্টা করে যায় আপ্রাণ মাছটি ধরার। সে বুঝতে পারে মাছের শক্তি কমে আসছে। গল্পকার মহিম বরা কিন্তু এখানেই আমাদের চমকে দিয়েছেন। জীবকান্তের তাই মনে হয়েছে, "মাছটা এরকম নিস্পন্দ হয়ে কী করছে, কী ভাবছে? ...ওরও কি 'উরুকা' আছে? মাছটাও কি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে? ছেলেমেয়ে-গাঁয়ের লোক- আত্মীয় কুটুম্ব-মাছের বউ-ছেলেও কি তার পথ চেয়ে বসে আছে বাবাসোনাদের মতো? তার মাথায় বারবার একটি চিন্তাই হানা দিচ্ছিল— মহাসাগরের বুকে দুটি মাত্র প্রাণী মৃত্যুর সাঙ্গ পাঞ্জা লড়ছিল, সঙ্গে কেউ ছিল না— ওরও না, মাছেরও না। দুজনেই ছিল নিঃসঙ্গ। ভাইপো ডম্বরু, তার গ্রামের লোকজন বিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখে গেছে শুধু। দুয়েরই মৃত্যুমুহূর্তে, একে অন্যের পরম আত্মীয়ের মতো একই সঙ্গে ঘুরছিল। তাহলে মাছটাই তো তার পরম আত্মীয়। যে মাছটা তাকে জীবনদান দিয়েছে, তাকে কিছুতেই মারতে পারে না জীবকান্ত। গল্পটির নামকরণের মধ্যে অসাধারণ এই ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে।

চরিত্র : 'মাছ ও মানুষ' গল্পের নায়ক জীবকান্ত সাধারণ এক জেলে। তার বিয়ে হয়েছে প্রায় চার বছর। তিন বছরের একটি ছেলেও আছে তার— 'বাবাসোনা'। আর্থিক অনটন থাকলেও পারিবারিক জীবনে সুখ আছে জীবকান্তের। তার একটাই আফ্‌সোস্ চার বছরের বিবাহিত জীবনে বউকে সে একটাও বড় মাছ ধরে দেখাতে পারেনি। নার, বাটা আর বোয়ালের বাচ্চার বাইরে আর কিছু তার জালে ধরা না পড়লেও স্বপ্ন দেখে জীবকান্ত, "বিশাল আকারের রুই বা কাতলা চার পাঁচজন লোক মিলে ধরাধরি করে বয়ে এনে উঠোনে ধপাস্ করে ফেলে দেবে— গ্রামের নারী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ের দল

এসে ঘিরে ধরবে সেই মাছটাকে। বউ তখন করছে কী? ছিলিমে তামাক সেজে একে ওকে দিতে ঘর বার করছে কতবার। ছিলিমে ফুঁ দেওয়ার ফুরসত নেই, সারাক্ষণ মুখে হাসি।" সামনেই ভোগালি বিহু। 'উরুকা'য় একটা ভালোকরে খাওয়াদাওয়া সবার স্বপ্ন। গ্রামবাসীদের নিয়ে জীবকান্ত তাই মহখুঁটি বিলে যায় মাছ ধরতে। ভোরবেলাকার রোদের মতো খুশিতে নেচে ওঠে তার মন। বারবার মনে পড়ে বউয়ের মুচকি হাসি আর শিশুনারাণের বাক্য, "অ্যাও বল মাছ পাবে।" একটা বিশাল মাছকে ধরতে গিয়ে মাঝদরিয়ায় চলে আসে জীবকান্ত। আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। সম্বিত ফিরে পেয়ে জীবকান্তের শরীরটা পাথরের মতো হিম হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে মৃত্যু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। এখন মাছ, পোলো সব ছেড়ে দিলেও সাঁতরে পাড়ে পৌঁছানো তার পক্ষে অসম্ভব। জ্যোতিষীর সতর্কবাণী মনে পড়ল। ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল শেষবারের মতো ছেলে আর বউকে দেখার। আর ঠিক তখনই সে বুঝতে পারল মাছটা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে মাটির নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে চলেছে। সেও সমানে চেষ্টা করতে লাগল মাছটাকে ধরে রাখার। উপলব্ধি করল শক্তি কমে আসছে মাছটার। অবচেতনে তার প্রশ্ন জাগলো— মাছটারও কি 'উরুকা' আছে? মাছের বউ ছেলেও কি পথ চেয়ে বসে আছে মাছটার জন্য। নিষ্পন্দ মাছটা কি তার মতো বাঁচতে চাইছে না! আর এখানেই জীবকান্ত অনেকখানি সরে এসেছে 'পদ্মানদীর মাঝি'র কুবের থেকে। তার শুধু মনে হচ্ছিল একটু আগেও তারা দুজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিল মহাসাগরের বুকে। কেউ ছিল না পাশে— ওরও না, মাছেরও না। মৃত্যুমুহূর্তে তারা উভয়েই একে অপরের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে পরমাত্মীয়ের মতো। যে মাছটা তাকে জীবনদান দিয়েছে, তাকে কিছুতেই মারতে পারে না জীবকান্ত। সঙ্গীরা সব কাছে চলে আসছে দেখে কুঁজো হয়ে শরীরটাকে জলে ডুবিয়ে দড়ি ধরে প্রাণপণে টান দেয় জীবকান্ত। মাছটাকে কষ্ট না দিয়ে গিঁটটা খোলার চেষ্টা করে। শেষ শক্তিতে দড়িটাতে সে প্রচণ্ড টান দিতেই আহত মাছটা প্রবল শক্তিতে ছিঁড়ে ফেলে দড়িটা। প্রকাণ্ড মাছটা তিনহাত লাফিয়ে উঠে গভীর জলে হারিয়ে যায়। বিলের চারপাশ তখন লোকে লোকারণ্য। ডম্বরুর হাতে তার পোলোটা তুলে দিয়ে জল ভেঙে পাড়ের দিকে এগোয় জীবকান্ত। বলে, "পুরনো দড়ি, ছিঁড়ে গেল রে।" ডম্বরু তখন পোলোরই মতো মুখ মেলে আছে। চোখ বিস্ফারিত। তহভম্ব ছেলেটি নিজের চোখদুটিকে বিশ্বাস করতে পারছিল না কিছুতেই, "কাকা মাছটা ছেড়ে দিল!!"

৩.৪.২ টোবা টেক সিং

নামকরণ : গভীর ব্যঞ্জনার সাক্ষ্য বহন করে 'টোবা টেক সিং' গল্পের নামকরণ। আমরা জানি, সাহিত্যের যে কোনো ফর্মেই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এর নামকরণ। নামকরণের মধ্য দিয়ে আমরা প্রথমে বোঝার চেষ্টা করি গল্প, কবিতা, উপন্যাস বা নাটকের মূল সুরকে। কখনো কখনো জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিটি আমাদের কাছে ধরা পরে নামকরণের হাত ধরেই। চরিত্রসৃষ্টির গভীর ভাবাদর্শও

ব্যঞ্জিত হয় নামকরণের মধ্য দিয়ে। পাগলাগারদের কয়েদি বিশন সিং-এর একসময় অনেক জমিজমা ছিল টোবা টেক সিং-এ। সম্পন্ন জমিদার বিশন সিং-এর মাথাটা একদিন আচমকাই বিগড়ে যায়। তখন ওর আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে শেকলে বেঁধে তাকে পাগলাগারদে ফেলে যায়। কিন্তু ট্র্যাজেডি হচ্ছে, পরিস্থিতি বদলে গেলেও বিশন সিং কিন্তু আটকে ছিল টোবা টেক সিং-এর সময়টাতেই। তাই দেশবিভাগ, দেশবিভাগের ফলশ্রুতিতে হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানের পাগলদের বদলাবদলি— এসব কিছুই তাকে তেমন ভাবায়নি। কথা সে খুব কমই বলত। শুধু জানতে চাইত মাঝেমধ্যে, "টোবা টেক সিং কোথায়?" এরইমধ্যে এসে গেল সেই চরমমুহূর্ত। সে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। পাগলদের অদল বদল করাটা খুব শক্ত হয়ে পড়ল। তারা কিছুতেই শান্ত হয়ে বসছিল না। পালাচ্ছিল এদিক সেদিক। কেউ উদোম হয়ে পড়ছিল। কেউ কাঁদছিল, কেউ ঝগড়া করছিল। বিশন সিং কিন্তু শান্তই ছিল। যখন তার পালা এল, তখন সে প্রশ্ন করল, "টোবা টেক সিংটা কোথায়? পাকিস্তানে না হিন্দুস্তানে?" অফিসার যখন উত্তর দিলেন 'পাকিস্তান' তখন বিশন সিং লাফিয়ে একদিকে সরে দাঁড়াল। কিছুতেই তাকে সেখান থেকে টেনে আনা গেল না। পুরোরাত সে দাঁড়িতে রইল ঠায়। ঠিক ভোর হওয়ার আগে আগে মাটিতে ঢলে পড়ে বিশন সিং। কর্তব্যরত অফিসাররা পরীক্ষা করে দেখেন তার শরীর প্রাণ নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য সে যেখানে পড়েছিল সে জারগাটা কিন্তু ভারত বা পাকিস্তান কারুরই ছিল না। এপারে কাঁটাতারের পেছনে পাকিস্তান। ওপারে সামনে ভারতবর্ষ। মাঝখানে জমির সেই টুকরোর ওপর, যেটার কোনো নাম ছিল না বা বলা ভালো যে জমির কোনো মালিকিয়ানা নেই, টোবা টেক সিং সেখানে পড়েছিল। এদিক দিয়ে গল্পটির নামকরণ গভীর ব্যঞ্জনাবহ।

চরিত্র : 'টোবা টেক সিং' গল্পে ছোটোবড়ো অনেকগুলি চরিত্র রয়েছে। শিখ পাগল, মুসলমান পাগল, পাহারাওলা, অফিসার, মহম্মদ আলী, ফজলুদ্দীন ইত্যাদি। তবে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশন সিং। গল্পের সমস্ত ঘটনা বা চরিত্রগুলি তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। বিশন সিং হিন্দু শিখ। পাগলাগারদে সে এসেছে বছর পনেরো আগে। টোবা টেক সিং নামে কোনো এক জায়গার সম্পন্ন জমিদার ছিল যে এক সময়। অনেক জমিজিরেত ছিল তার। কিন্তু আচমকা একদিন তার মাথাটা বিগড়ে যায়। আত্মীয়-স্বজনেরা তখন তাকে পাগলাগারদে ভর্তি করে দেয়। কথা সে খুব কম বলত। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হয় চুপ করে থাকত নয়তো কদাচিৎ "ওপর দি গড়-গড় দি অ্যানেক্স দি বেধ্যানা দি মুঁগ দি দাল অফ দি লালটেন" বলে দিত। সে না দিনে ঘুমাতো, না রাতে। পাহারাদাররা বলত, এই পনেরো বছরের লম্বা সময়ে ও এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোয়নি। শুতো না পর্যন্ত। কখনো সখনো জেলের কোনো একদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে নিত শুধু। সব সময় দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে ওর পা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল। পায়ের ডিমও ফুলে গিয়েছিল। এত শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও শুয়ে একটুও বিশ্রাম করত না। হিন্দুস্তান, পাকিস্তান আর পাগলদের বদলির কথা নিয়ে যখন পাগলদের মধ্যে আলোচনা হত ও মন দিয়ে শুনত। ওর মতো কী কেউ প্রশ্ন করলে ও গম্ভীরভাবে উত্তর দিত— "পর দি

গড়-গড় দি অ্যানেক্স দি বেধ্যানা দি মুঁগ দি দাল অফ পাকিস্তান গবর্নমেণ্ট।" বিশন সিং-এর মাথায় চুল খুব কম। যেহেতু সে খুব কম চান করত, দাড়ি আর চুল এমন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে যে ওর মুখের চেহারা ভয়ানক দেখাত। কিন্তু কারো ক্ষতি সে কোনোদিন করেনি। পনেরো বছরের মধ্যে কারো সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করেনি। প্রতিমাসে ও কেমন করে যেন বুঝতে পারত যে আজকে কেউ দেখা করতে আসবে। সেদিন সারা শরীরে সাবান লাগিয়ে সে স্নান করত। মাথায় তেল লাগিয়ে চুল আঁচড়াতো। নিজের কাপড়চোপড় যা ও কখনোই ব্যবহার করত না, বার করে পরে সেজেগুজে যারা দেখা করতে আসত তাদের কাছে যেত। ওর ছোট্ট মেয়ে রূপ প্রতি মাসে বাড়তে বাড়তে পনেরো বছরের হয়ে গেছে। বিশন সিং-এর কেমন ধাঁধা লেগে যেন। পাগলদের বদলাবদলির দিন কাছে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আরও চুপচাপ হয়ে যায় বিশন সিং। শুধু মাঝে মাঝে একটাই প্রশ্ন করে, "টোবা টেক সিং কোথায়", অদলবদলের কাজে কর্মরত এক অফিসারকেও এই প্রশ্নই করে বসে সে। উত্তরে অফিসার জানান যে টোবা টেক সিং পাকিস্তানের একটি অংশ। ভূতগ্রস্থের মতো বিশন সিং তার জায়গা থেকে তখন পিছিয়ে আসে। হাজার চেষ্টা করেও সৈনিকেরা তাকে ভারতবর্ষে পাঠাতে পারে না। সারারাত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ভোরবেলা মারা যায় সে। তার শরীরটা এমন জায়গায় পড়েছিল যার মালিকানা কোনো দেশের হাতে ছিল না। যে বিশ্বাস নিয়ে জীবনের এতটা দিন সেও কাটিয়েছে, সেই একই বিশ্বাস নিয়ে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ে বিশন সিং।

৩.৪.৩ বিজয় উৎসব

নামকরণ : এবারে আমরা আলোচনা করব 'বিজয় উৎসব' গল্পের নামকরণ। যুদ্ধের বাজারে নিউছুনা গাঁয়ে চারদিকে হাহাকার। সাধারণ লোকগুলি চালের অভাবে বুনোফল 'শ্যামাচাল' খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। কেরোসিনের অভাবে সন্ধ্যা নামতেই চারদিক শ্মশানের মতো নিস্তব্ধ। তার উপর অদ্ভুত এক রোগ ছড়িয়ে পড়েছে গাঁয়ে। প্রথমে হাড়গোড় ফুলে যায়। তারপর সব শেষ। গল্পের নায়ক মুকুন্দর মা ও ছোটো দুটি ভাই মারা গেছে। বাবা গুণ পরিডা দুমাস ধরে শয্যাশায়ী। মুকুন্দ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বাবা আর ছোটোবোন মানিককে সে বাঁচাবেই। গাঁয়ের বৈদ্য নিধি মেকাপের কথামতো সে বাবার পথ্য 'পুরনো চাল' জোগার করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। দুক্রোশ দূরে মণিজঙঘার সাধু পাণ্ডার দোকান থেকে বাড়ি ফিরে এসে মুকুন্দ দেখে তার বাবা মারা গেছে। পথ্যের চালেই শ্রাদ্ধ হয় গুণ পরিডার। গাঁয়ের সবাই পথ চেয়ে বসে আছে— "জাপানটা হেরে গেলেই আবার ধানচাল সস্তা হবে।" কিন্তু মাণিককে নিয়ে মুকুন্দ খুব চিন্তিত। শুধু দুটো শুকনো চিঁড়ে ভাজা চিবিয়ে কত দিন বাঁচবে বোনটা! একবেলা অন্তত গরম ভাত একটু খেতে পেলে শরীরে বল আসত। ধার করে আনা পাঁচটাকার একটাকা তখনো অবশিষ্ট ছিল। মুকুন্দ সেটা নিয়ে বেরোয় ধান কিনতে। এক টাকার ধানে মানিকের বেশ ক'দিন চলবে। তার ওপর বাঞ্ছা সাহুর বাড়িতে মুকুন্দর যা হোক কিছু জুটবে। পথে

শ্মশান পড়ে। সেখানে শুধু মানুষের হাড় আর হাড়। এতটুকু জায়গা খালি নেই। ধড় থেকে আলাদা হয়ে গড়াচ্ছে কত মাথা। চোখ, নাকের বদলে একটা করে খালি গর্ত। ঠোঁট, নখ, দুপাটি দাঁত বেরিয়ে পড়ে কী ভয়ানক দেখাচ্ছে। পাঁজরের খাঁচার মধ্যে পেট, নাড়িভূঁড়ি কিছু নেই। এক টাকার ধান মাথায় নিয়ে মণিজঙ্ঘা থেকে বেরোয় মুকুন্দ। বেলা পড়ে আসছে দেখে সে তড়িঘড়ি নদী পার হয়। হঠাৎ শরীরটা গুলিয়ে ওঠে ওর। ডোবা থেকে এক আঁজলা জল খেতে গিয়ে সে আর টাল সামলাতে পারে না। পড়ে যায়। আর উঠে না। তার সারাদিনের পথচলা শেষ হয়ে যায়। আর তখনই গাঁয়ের চৌকিদার খবর নিয়ে আসে, যুদ্ধে জাপানের হার হয়েছে। দরজায় দরজায় আমপাতা ঝুলিয়ে বিজয় উৎসব পালনে ব্যস্ত হয়ে ওঠে গ্রামবাসী। তবে সবচেয়ে বড় করে বিজয় উৎসব পালন মুকুন্দর। মানুষের কাঁধে চেপে যাত্রার সৌভাগ্য আগে কখনও হয়নি তার। রজ উৎসবে হাডুডু খেলায় জিতলেও কেউ তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েনি। আজ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তারই যেন শোধ তুলল মুকুন্দ। এও এক বিজয় উৎসব!

চরিত্র : গুণ পরিডা, নিধি মেকাপ, সাধু পাণ্ডা, মানিক, ঘনিয়া ইত্যাদি অনেকগুলি চরিত্র থাকেলও 'বিজয় উৎসব' গল্পের মুখ্য চরিত্র অবশ্যই মুকুন্দ। গল্পটির শুরু এবং শেষ তাকে নিয়েই। নিউছুনা গাঁয়ের মুকুন্দ ছোট্ট থেকেই বাবা-মায়ের কাছে শুনে এসেছে যে সে তাদের পোষ্যপুত্র। তার বয়স সতেরো। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই চাষ-আবাদের কাজ সে রপ্ত করে নিয়েছে। জল টানা, মাটি কোপানো কোনো কিছুই তার আটকায় না। মা থাকলে এতদিনে বিয়ে থা হয়ে যেত। অসুস্থ বাবাকে সুস্থ করে তুলতে সে যেমন আপ্রাণ খেটেছে তেমনি ছোটোবোনের দিকেও ছিল তার সতর্ক দৃষ্টি। নিজে অভুক্ত থেকেও বোনকে সে জোর করে খাওয়ায়, "কে বলল তোকে কিছু খাইনি? আমি কখন কী খাই তোকে দেখিয়ে খেতে হবে? তুই কি আমার গুরুজন না কি খেতে-পরতে দিয়ে আমাকে পুষেছিস? ...হাটে বাজারে চলাফেরার মানুষ আমি। মুড়ি-চিঁড়ে যখন যা পাই খেয়ে নিই। আজ তোকে খেতে হবে।" মুকুন্দর আত্মমর্যাদা জ্ঞান টনটনে। শত দুঃখেও কারো কাছে মাথা হেঁট করতে চায়নি। তাই মানিক যখন জানায় যে, "জেনাদের বাড়ি দু-বেলা উনোনে আঁচ পড়ে", তখন ভীষণ রেগে যায় মুকুন্দ। বলে, "তুই পেতনি না শাঁকচুন্নি? অ্যা? বলি জেনাদের বাড়ি রাঁধাবাড়া হয়, তাই তুই গিয়ে ভিক্ষে চাইবি! গুণ পরিডার ছেলে আমি, খেয়াল আছে? বরং হাওয়া খেয়ে থাকব, কিন্তু মেগে খাওয়া আমাদের কুষ্ঠিতে নেই।" বাবাকে পারেনি, কিন্তু এই বোনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই মুকুন্দ দু-ক্রোশ দূরে মণিজঙ্ঘার গরমে সাধু পাণ্ডার দোকানে যায় চাল কিনতে। চাল কিনে ফিরে আসার পথে তার শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে যায়। রোদের গরমে তার বমি পায়। ডোবা থেকে এক আঁজলা জল খেয়ে মুকুন্দ আর নিজেকে সামলাতে পারে না। বমি করে দেয়। ধান-ক্ষেতের আলের ওপর উঠতে যায়। একটা পা ওপরে তোলে। অন্য পা-টা তুলতে গিয়েও পারে না। পড়ে যায় মুকুন্দ। আর উঠে না। শেষ নিঃশ্বাস নেওয়ার আগে সে স্বপ্ন দেখে, "কাল সকালে উঠে মাণিক একবেলা গরম গরম ভাত রাঁধতে।"

৩.৪.৪ ইলিশ মাছের স্বাদ

নামকরণ : 'ইলিশ মাছের স্বাদ' গল্পটির আরম্ভ, climax এবং পরিণতি একটি ইলিশ মাছকে কেন্দ্রে রেখে। গল্পটির ছোট্ট পরিসরে একদিকে যেমন রয়েছে জেলেদের গোষ্ঠীজীবন, তেমনি তাদের ব্যক্তিজীবনও এখানে ফুটে উঠেছে। চাওবা অত্যন্ত গরীব জেলে। তিন ছেলে-মেয়ে আর অসুস্থ স্ত্রী নিয়ে তার সংসার। বিবাহিত বড়ো মেয়েটি সন্তানসম্ভবা। চাওবার খুব ইচ্ছে তার বড়োমেয়ে সামারেকে একবেলা ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খাওয়াবে। এই গোপন অভিলাষ নিয়েই ছেলে মণির সঙ্গে চাওবা মাছ ধরতে বরাক নদীতে যায়। মণিকে ঘুমচোখে ঝিমুতে দেখে ক্ষেপে যায়, "অ্যাই মণি, সূর্য উঠি যায় আর তুমি এখনো বইয়া ঝিমাইরায়। চউখে মরিচর গুঁড়া লাগাই দিতামনি। জলদি পানিত মুখ ধুইয়া লও।" নাউরেমদের ঘাটে এসে ধবধবে সাদা বেশ বড়সড় একটা ইলিশ তাদের জালে ধরা পড়ে। ক্রেতার চোখ বাঁচিয়ে চাওবারা বাড়িতে ফিরে আসে। মুহূর্তে খুশির হাওয়া খেলে যায় চারদিকে। ছোটো ছেলে মুক্তার আজ বড় আনন্দ। সে তার খেলার সঙ্গী তোমচৌকে হাত-পা নাচিয়ে খুশির চোটে বলে, "হুনছনি আইজ তো আমরা ইলিশ মাছ খাইমু। গাঙ্গরতন ধইরা আনছে আমার বাবায়, অততো বড়। তুমিতাইন খাইছনি কুনদিন?" আর ঠিক তখন বিষণ্ণ মনে চাওবার ছোটো মেয়ে তম্ফা জানায়, "বাবা, অখন রানবার চাউলওতো নাই, কিতা করা যায় বাবা?" কথাটা শুনামাত্রই চাওবার সারা শরীর জ্বলে যায়। ইচ্ছে হয়, সব ভেঙেচুরে ফেলে দেয়। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে রোয়া উঠা একটা বুড়ো কুকুরের ওপর। কোনো কিছু না ভেবেই বসার পিঁড়িটি ছুঁড়ে মারে। চির-রুগ্‌ণ স্ত্রীকে চোখের সামনে দেখে ক্ষোভে, দুঃখে সে ফেটে পড়ে "আর পারিয়ার না। মরবার অইলে মরি যাওগি, কত আর মাইনষেরে জ্বালাইবায়?" প্রতিবেশী থানিনজাউ ততক্ষণে তার বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্দেশ্য ইলিশ মাছটি কেনা। নিরুপায় চাওবা কাতর কণ্ঠে বলে, "টাকা কিন্তু এখনোই দিতে অইবো, চাউল কিনতাম", দরদাম মিটিয়ে মাছ নিয়ে বেরিয়ে আসে থানিনজাউ। ইলিশ মাছ দিতে ভাত খাবে বলে এতক্ষণ খুশিতে ডগমগ ছিল মুক্তা। থানিনজাউকে মাছ হাতে বেরিয়ে যেতে দেখে হতবাক ছেলেটি চিৎকার করতে থাকে, "বাবা, আমরার মাছ নিছেগি, আমরার মাছ নিছেগি।" গল্পটির নামকরণ এর চেয়ে যথার্থ বোধহয় আর কিছু হতে পারে না!

চরিত্র : সুখে-দুঃখে, ভালো লাগা-মন্দলাগার চাওবা একটি যথার্থ রক্তমাংসের মানুষ। জীবিকার সঙ্গে নিত্য টানাপোড়েন চলেছে তার সচেতন মনের। যদিও গল্পকার তাকে এক দুর্বল, মোহগ্রস্থ চরিত্র হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চাননি। আঁকতে চাননি তাকে হীনপ্রবৃত্তির নায়করূপেও। পাপ-পুণ্যের ফাঁকা-আওয়াজ তার ছিল না। এই জন্যেই অসুস্থ স্ত্রীর ওপর সে বিরক্ত, "আর পারিয়ার না। মরবার অইলে মরি যাওগি, কত আর মাইনষেরে জ্বালাইবায়?" তার মানে এই নয় যে স্ত্রীকে চাওবা ভালোবাসে না। এই বিরক্তি তার অসহায়তাকেই তুলে ধরেছে। জীবনের ছোটোবড় ব্যাপারে সে সুখ-দুঃখের শরিক বানায় বড়োছেলে মণিকে। বেঁচে থাকার নির্মম প্রয়োজনে যে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি হতো না, তা নয়। কিন্তু থানি-জাউদের বিস্তৃত অধিকারের বাইরে তার কোনো বাড়তি পরিচয়

ছিল না। জেলেজীবন থেকে সে নিষ্কৃতি চায় ঠিকই, তবে মাছ ধরায় ভাটা পড়ুক এটাও তার সহ্য হয় না। মণির আলসেমিতে তাই সে খেঁকিয়ে ওঠে, "অ্যাই মণি, সূর্য উঠি যায় আর তুমি এখনো বইয়া ঝিমাইরায়। চউখে মরিচর গুঁড়া লাগাই দিতামনি। জলদি পানিত মুখ ধুইয়া লও।" সন্তান সম্ভবা বড়োমেয়ে সামারেকে ইলিশ মাছ দিয়ে একবেলা ভাত খাওয়ানোর খুব ইচ্ছে ছিল চাওবার। নাউরেমদের ঘাটে সে আর মণি দুজনে মিলে ধরেছিল ধবধবে সাদা বেশ বড়সড় একটা ইলিশ। ঘাড়মোটা বুড়োটা মাছটা কিনতে চায়। কিন্তু কিছুতেই টলানো যায় না চাওবাকে। সে বলে, "কইলে তো শরমের কথা, বেচতে বেচতে নিজে তো আর খাই না। ইলিশা মাছের স্বাদই প্রায় ভুলি গেছি। আইজ আর বেচতাম নায় নিজেরাই খাইমু।" কিন্তু বাড়ি ফিরে এলে মেয়ে তম্ফা জানাল, "বাবা অখন রানবার চাউলও তো নাই, কিতা করা যায় বাবা?" রাগে, হতাশায় দিগ্‌বিদিগ্‌শূন্য চাওবা বসার পিঁড়িটি ছুঁড়ে মারে সামনে বসে থাকা কুকুরটির দিকে। প্রতিবেশী থানিনজাউ তখন তার উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। উদ্দেশ্য মাছটি কেনা। কিছু করার থাকে না চাওবার। নিরুপায়, কাতর গলায় সে শুধু বলে, "টাকা কিন্তু এখনোই দিতে অইবো, চাউল কিনতাম।"

৩.৫ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

'ভারতজোড়া গল্পকথা'য় রয়েছে আঠারোটি ভাষায় পঁয়চাল্লিশটি গল্প। ভারতীয় জীবনের একশো বছরের চালচিত্র এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাঝদরিয়ার জেলে থেকে বিভাজিত দেশের পাগল অথবা অন্নহীন আধন্যাংটো মানুষ— কে নেই এখানে! ভারতবর্ষের প্রকৃতি, ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি, যৌনতা, মিথ, ইতিহাস, বাস্তবতাকে কৌশলে তুল ধরেছেন গল্পকাররা। অথচ প্রকাশভঙ্গির পরিমিতিবোধ শিথিল হয়নি কোথাও। সব মিলিয়ে এক আধুনিক মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত হই আমরা। একদিকে যেমন রয়েছে অসমিয়া গ্রামজীবনের সাধারণ মানুষদের সুখ-দুঃখের কথা (মাছ ও মানুষ), অন্যদিকে তেমনি রয়েছে দেশভিভাগ জনিত উদ্বাস্তু সমস্যা (টোবা টেক সিং)। কোথাও আমরা মুখোমুখি হই যুদ্ধবিধ্বস্ত অন্নহীন মানুষের সঙ্গে (বিজয় উৎসব), আবার কোথাও আমাদের সামনে চলে আসে নিজরে ইচ্ছেগুলিতে দাঁড়ি টেনে বেঁচে থাকতে বাধ্য মানুষেরা (ইলিশ মাছের স্বাদ)। আধুনিক যুগ-জীবন ও যুগমানসের নানান বিষয়কে অবলম্বন করেছেন এই গল্পকাররা। ঐতিহ্যের অনুসরণ, সমকালীন প্রসঙ্গ, এখানে এসেছে সবকিছুই। উপস্থাপনার নৈপুণ্যে এবং রক্তমাংসের চরিত্র সৃষ্টিতে ছোটোগল্পের সীমানা প্রসারিত হয়েছে বহুদূর।

ছোটোগল্প নিয়ে যখন আপনারা আলোচনা করবেন তখন তার সংজ্ঞা কী, স্বরূপ কেমন, বৈশিষ্ট্য কী কী— এই সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। আমরা এখানে তার বিস্তৃত আলোচনা করেছি। আপনাদের পাঠ্য চারটি গল্পেরই যথাসম্ভব পরিচয় আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ছোটোগল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই গল্পগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে আপনাদের।

৩.৬ প্রাসঙ্গিক টীকা (Summing Up)

দেওলা — অপদেবতা

পোলো — এতে বড় মাছ ধরা হয়।

জুলুকি — ছোটোমাছ ধরার উপযুক্ত সামগ্রী।

টোনা — যে পাত্রে মাছকে ধরে রাখা হয়।

খরিচা — বাঁশের কচি কোঁড় কেটে শুকিয়ে নিয়ে তার থেকে প্রস্তুত গুঁড়ো।

মরিচা — মশলাপাতি।

জমীন্দার — মুসলিম ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ।

কায়দে-আজম — দেশের শাসক।

ভরুন্ডা — এক প্রকার খাদ্য দ্রব্য।

ওয়াগা — ভারত-পাকিস্তান বর্ডার।

পানা — চিনির জল।

রজ উৎসব — ওড়িশায় আষাঢ় মাসের সংক্রান্তি, তার পূর্ব ও পরদিন— এই তিনি দিন ধরণী ঋতুমতী হন বিশ্বাসে কর্ম উৎসাহ ও মায়ার আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য রজোগুণের বন্দনা-উৎসব চলে।

শ্যামাচাল — ধান গাছের মতো লম্বা লম্বা ঘাসের ডগায় বুনো ফল, চালের বিকল্প হিসেবে গরিব লোকের খাদ্য।

পানি — জল

শলই — দেশলাই

ইলান — এমন

কইতো — বলতে

জিবরাত — জিব

পুয়া — ছেলে

মাইয়া — মেয়ে

হুনলাম — শুনলাম

হাছানি — সত্যি কি

গাঙ্গরতন — নদীর রত্ন (ইলিশ)

তুমিতাইন — তোমরা

কিতা — কী

অইলে — হলে

নাইওর — পিতৃালয়

মাগনা — বিনে পয়াসায়

৩.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

১। ছোটোগল্প কাকে বলে? ছোটোগল্পের লক্ষণগুলো সম্পর্কে আপনার ধারণা স্পষ্ট করুন।

২। ছোটোগল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করে এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩। 'মাছ ও মানুষ' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৪। 'মাছ ও মানুষ' গল্পটির জীবকান্ত চরিত্রটি আলোচনা করুন।

৫। 'টোবা টেক সিং' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৬। ভারতীয় ছোটোগল্পে বিশন সিং একটি উজ্জ্বল চরিত্র — আলোচনা করুন।

৭। 'বিজয় উৎসব' গল্পটির পরিবেশ সৃষ্টিতে লেখক যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

৮। 'বিজয় উৎসব' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৯। 'বিজয় উৎসব' মুকুন্দ পরিডার জীবনের গল্প — আলোচনা করুন।

১০। 'ইলিশ মাছের স্বাদ' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

১১। হাসি-কান্নায়, সুখে-দুঃখে চাওয়া রক্তমাংসের মানুষ — আলোচনা করুন।

১২। 'ইলিশ মাছের স্বাদ' গল্পটির বড় সম্পদ এর ভাষা — আলোচনা করুন।

(বিঃ দ্রঃ এছাড়া নামকরণের সার্থকতা ও চরিত্র বিশ্লেষণ নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে।)

৩.৮ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

১। জগদীশ ভট্টাচার্য : আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী

২। তপোধীর ভট্টাচার্য : প্রতীচ্যের সহিত্যতত্ত্ব

৩। অরূপকুমার ভট্টাচার্য : কালের পুত্তলিকা

৪। চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত : মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া

৫। বিনয় ঘোষ : মেট্রোপলিটন মন-মধ্যবিত্ত-বিদ্রোহ

৬। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : সাহিত্য বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ

৭। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

৮। রথীন্দ্রনাথ রায় : ছোটোগল্পের কথা

৯। তপোধীর ভট্টাচার্য : ছোটোগল্পের বির্নির্মাণ

১০। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা) : গল্পচর্চা

* * *

বিভাগ-৪

ফণীশ্বরনাথ রেণুর ছোটোগল্প সংকলন

ফণীশ্বরনাথ রেণুর ছোটোগল্প সংকলন : লেখক পরিচিতি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিষয় বিন্যাস

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৪.২ লেখক পরিচিতি

৪.৩ কাহিনিকার ফণীশ্বরনাথ রেণু

৪.৪ রেণুর ভাষা শৈলী

৪.৫ রেণুর ছোটোগল্পে আঞ্চলিকতা

৪.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৪.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৪.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৪.০ ভূমিকা (Introduction)

ফণীশ্বরনাথ 'রেণু' হিন্দী কথাসাহিত্যের এক বহুচর্চিত এবং পরিচিত নাম। রেণুর ব্যক্তিত্ব ছিল বহুমুখী, একাধারে তিনি ছিলেন সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ ও সাহিত্যিক। তিনি তাঁর পাঁচটি উপন্যাস এবং পাঁচটি গল্প সংগ্রহে যে গ্রামীণ জীবনের চিত্রণ করেছেন তা মূলত মুন্সী প্রেমচন্দের পরম্পরা বাহিত হলেও গ্রামীণ জীবন, গ্রাম্য ভাষা, পরিবেশ ও লোকাচার, বিশ্বাস-কে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়ে হিন্দী আঞ্চলিক উপন্যাসের জনক হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। তাঁর রচিত গল্পেও এই আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখা যায়। উপন্যাস রচনার পাশাপাশি গল্প রচনাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করে সমালোচকের সমাদর লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

৪.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি হিন্দী ভাষায়ও যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হচ্ছে, তার সম্পর্কে সামান্য কিছু ধ্যান-ধারণা জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই হিন্দী সাহিত্যের বিশাল সমুদ্র-সদৃশ সাহিত্যসম্ভার থেকে মুন্সী প্রেমচন্দের পরই হিন্দী সাহিত্যজগতের যাঁর স্থান, সেই জনপ্রিয় তথা সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ফণীশ্বর 'রেণু'র কয়েকটি গল্পকে

আলোচনার বিষয় হিসাবে চয়ন করা হয়েছে। আমরা এই বিভাগে রেণুর কয়েকটি নির্বাচিত গল্পের সঙ্গে পরিচিত হব। এই পর্বে আমরা লেখকের জীবন তথা সাহিত্য সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরব এবং আঞ্চলিকতা, ভাষাশৈলী, চরিত্রগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৪.২ লেখক পরিচিতি

হিন্দী সাহিত্যজগতের অপ্রতিম গদ্যশিল্পী শ্রী ফণীশ্বরনাথ রেণু প্রথম জীবনে কবিতা ও গল্প রচনা দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করলেও ১৯৫৪ সালে রচিত 'ময়লা আঁচল' তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। এই উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী সাহিত্য জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়, আর প্রেমচন্দের পর শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হিসেবে সমাদৃত হন তিনি। বহুচর্চিত এই উপন্যাস রচনার জন্য রেণু প্রশংসিত হয়েছেন যেমন, সমালোচিতও হয়ছেন ততখানি। প্রথম উপন্যাস রচনার মাধ্যমেই খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যাওয়া এই লেখকের জীবন ঘটনাবহুল যেমন, তেমনই বৈচিত্র্যময় ও চিত্তাকর্ষকও।

অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন এই লেখকের জন্ম হয় বিহারের পূর্ণিয়া জেলার ঔরাহি, হিংগনা গ্রামের এক মধ্যবিত্ত কৃষিজীবি পরিবারে ১৯২১ ৪ঠা মার্চ তারিখে। পিতা শ্রী শিলনাথ ও মাতা শ্রীমতী পন্না দেবীর সন্তান ফণীশ্বরনাথ ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার পাশাপাশি রাজনীতির প্রতিও আকর্ষিত হয়েছিলেন। সেই সুবাদেই ১৯৩০ সালে বানর সেনার সদস্য থাকাকালীন মাত্র নয় বছর বয়সে তাঁর প্রথম জেল খাটা। আর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগও ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে লক্ষ করা যায়। রেণুর সাহিত্যচর্চা শুরু হয় ১৯৩৬ সালে স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিনে লেখালেখির মাধ্যমে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম বয়সে কংগ্রেস কর্মী বাবার সান্নিধ্যে রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ অধিকতর হয়ে ওঠার ফলে তাঁর সাহিত্যিক সত্তাটি চাপা পড়ে যায়। ১৯৩০-৩১ সালে আররিয়া হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে পিকেটিং করেন ও তার জন্য শিক্ষকের কাছে শাস্তি পান। তারপর ১৯৩১-৩২ সালে দশ বছর বয়সে ফারবিসগঞ্জ হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা চালিয়ে যান। 'লী অ্যাকাডেমি' নামক এই স্কুল থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। পরবর্তী শিক্ষার জন্য তাঁকে বেনারস পাঠানো হয়, কিন্তু রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে যুক্ত হয়ে তাঁর পড়াশুনা আর এগোলো না। পরে বিহারে ফিরে এসে রেণু ভাগলপুর টি.এন.জে. কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু ৪২ -এর আন্দোলনে আবার জড়িয়ে পড়ার ফলে শিক্ষাজীবন ব্যহত হয় তাঁর। বিদ্যার্থী জীবনের অধিকাংশ কালই তাঁর কেটেছে ঘর থেকে দূরে হোস্টেলে। মাত্র আট বছর বয়স পর্যন্তই গ্রামে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। তবুও গ্রামের প্রতি, গৃহের প্রতি আকর্ষণ সারজীবন অটুট ছিল তাঁর।

১৯৩৫ সালে রেণুর জীবনে এক নতুন মোড় আসে, কেন-না এই বছরই ঘর

থেকে পালিয়ে নেপালের বিখ্যাত কৈরালাভবনে পদার্পণ ও এক নতুন জীবনের আরম্ভ করেন তিনি। বিরাটনগরে অবস্থিত কৃষ্ণপ্রসাদ কৈরালার আশ্রমতুল্য বিদ্যালয়ে থেকে কেবল বিদ্যালাভই নয়, বিভিন্নভাবে মানসিক বিকাশও সম্ভব হয়েছে। কেন-না এখানে এসেই সাহিত্য, রাজনীতি এবং কলা-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। সংসারের সমস্ত বিখ্যাত লেখক সম্পর্কে অবগত হন এখানেই — এঁদের লেখাও এখানেই এসে পড়েছিলেন তিনি।

১৯৪২ সালে দেশে ফিরে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে তাঁর কারাবরণ হয় ও ১৯৪৪ সালে তিনি কারামুক্ত হন। কারাবাসের এই কাল রেণুকে নানাভাবে ঋদ্ধ করেছে। এখানেই তিনি বিখ্যাত রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছেন এবং জীবনের বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও চালিয়ে যান রেণু। সেই সূত্রেই পূর্ণিয়া জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন তিনি। কিন্তু ১৯৫০ সালে আবার নেপালে পদার্পণ করেন ও নেপালি জনতাকে রাজতন্ত্রের শোষণ ও অত্যাচার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সেখানকার সশস্ত্র ক্রান্তি ও রাজনীতিতে যোগদান করে কৈরালদের নেতৃত্বে মুক্তিসেনার সৈনিক হয়ে গেরিলা যুদ্ধ করেন। এর পূর্বে ১৯৪৭ সালেও একবার বিরাট নগর মজদুর আন্দোলনে যোগদান করে গ্রেপ্তার হয়েছিল তিনি। এভাবেই স্বদেশ এবং প্রতিবেশী দেশ নেপালের রাজনীতিতে বরাবর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন রেণু। মাত্র নয় বছর বয়সেই রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করে জীবনের অধিকাংশ কাল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে অতিবাহিত করেছেন। বিশেষ করে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন রেণু। যদিও শেষজীবনে পার্টি-রাজনীতির প্রতি আস্থা হারিয়েছিলেন আর সেজন্যই পরবর্তীকালে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেননি তিনি। তবে রাজনৈতিক চেতনা তাঁর মন থেকে উধাও হয়নি কখনোও, তাই ১৯৭২ সালে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে বিধানসভার ভোটে দাঁড়ান তিনি, যদিও সেবার পরাজয় ঘটেছিল তাঁর।

সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার ফলস্বরূপ সর্বসাকুল্যের চার বার কারাবরণ করতে হয়েছে রেণুকে। প্রথমবার ১৯৩০, দ্বিতীয়বার ১৯৪২, তৃতীয়বার ১৯৪৭ এবং ১৯৭৪ চতুর্থবার। প্রথমবার হয়েছিল ১৪ দিনের জেল, আর শেষবার ৬২ দিন। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও যখন জোরকদমে চলছিল, তখনই ভাঙ্গল তাঁর স্বাস্থ্য। দুরারোগ্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে পাটনা টি.বি সেন্টার ভর্তি করানো হল রেণুকে। মৃত্যুপথযাত্রী রেণু প্রায় ১৪ মাস থাকলেন হাসপাতালে এবং শ্রীমতী লতিকা রেণুর অক্লান্ত সেবার ফলে আরোগ্য লাভ করেন। এরপর তাঁরা দুজন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। দ্বিতীয় বিবাহের পর রেণু পাটনাতেই থাকতে শুরু করেন, আর গ্রামের বাড়িতে থেকে যান তাঁর প্রথমা পত্নী ও সন্তানেরা। এই অসুস্থতার পর্বেই তিনি লিখতে শুরু করেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসে "মেয়লা আঁচল" এবং ১৯৫৪ সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। অচিরেই

এই উপন্যাস তাঁকে আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক হিসেবে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত করে। এরপর থেকে একে একে রচিত হতে থাকে উপন্যাস, গল্প, রিপোর্টজ ইত্যাদি। এছাড়াও নেপালের বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সাহিত্যিক বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা-র সাহিত্যকর্মের অনুবাদ করেছেন, কবিতা ও দু-একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। রেণু রচিত পত্রগুলোও পত্রসাহিত্যের শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে, আর জীবনের শেষ পর্বে এসে হিন্দী চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে "তিসরি কসম", "এক অধুরী কহানী" ইত্যাদি ফিল্মের পটকথাও লিখেছিলেন তিনি। হিন্দী সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখাতেই নিজের সৃজনশীল প্রতিভার চমক নিয়ে হাজির হয়েছিলেন রেণু। প্রতিথযশা সাহিত্যিক তথা রাজনীতিবিদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মন ছিল মাটির কাছাকাছি। কৃষক পরিবারে জন্মালাভের সূত্রে কৃষিকর্মের প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম আগ্রহ। চাষবাসকে তিনি সাহিত্যচর্চার থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন না। তাই সাহিত্য রচনার পাশাপাশি কৃষিকাজও সমান তন্ময়তার সঙ্গে করতেন। 'মেয়লা আঁচল' রচনার কাল থেকে এই বছরগুলোকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, উথালপাতাল সময়। এই সময়ই রাজনীতির ক্ষেত্র দূরে সরে এসে সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন রেণু জীবনের সায়াহ্নকালে পুনর্বার রাজনৈতিক আন্দোলনে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে পুলিশি দমন নীতির শিকার ও কারাবন্দী হন। সেই সময় সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধতা করে পদ্মশ্রী প্রত্যাখ্যান করেন। জেল থেকে ফিরে আসার পর নানা মানসিক ও পারিবারিক চাপের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ১৯৭৬ সালে বেশ বড় ধরনের অসুখে পড়েন ও অস্ত্রোপচারের পর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়, কিন্তু সেই উন্নতি স্থায়ী ছিল না। ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে আবার কঠিন অসুখে পড়েন তিনি। অবশেষে বৈচিত্র্যময় কর্মমুখর এক জীবন থেকে বিদায় নিয়ে ১৯৭৭ সালের ১১, এপ্রিল দেহাবসান ঘটে তাঁর।

উপন্যাস ও গল্প ব্যতিরেকে হিন্দী গদ্যসাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও ফণীশ্বরনাথ রেণু নিজ প্রতিভার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। রিপোর্টাজ, সংস্মরণ, নিবন্ধ, সাক্ষাৎকার, স্কেচ, হাস্য-ব্যঙ্গ, পত্র, ডায়রি, নাটক, পটকথা, অনুবাদ, টিপ্পনী, গদ্যগীত ইত্যাদি বিভিন্ন শাখাতেই তাঁর মৌলিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবে সমধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় রেণু রচিত উপন্যাসগুলো হল —

মেয়লা আঁচল (১৯৫৪ খ্রি:), পরতী পরিকথা (১৯৫৭ খ্রি:), পল্টুবাবু রোড (১৯৫৯ খ্রি: থেকে মাসিক পত্রিকা জ্যোৎস্নায় ধারাবাহিকভাবে ও রেণুর মৃত্যুর পর ১৯৭৯ সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়), দীর্ঘতপা (১৯৬৩ খ্রি:, পরবর্তীকালে উপন্যাসটির পরিবর্ধিত সংস্করণ কলঙ্কমুক্তি নামে ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়।), জুলুস (১৯৫৬ খ্রি:) এবং কিতনে চৌরাহে (১৯৬৬ খ্রি:)। এছাড়াও রেণু রচনাবলি ৩য় খণ্ডে 'রামরতন রায়' নামক একটি অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে।

ঔপন্যাসিক হিসেবে বিখ্যাত ফণীশ্বরনাথ রেণু কিন্তু সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন কবিতা রচনার মাধ্যমে। বিশিষ্ট হিন্দী কথাসাহিত্যিক প্রেমচন্দের মৃত্যুর ঠিক একমাস পর

১৯৩৬ সালে একটি কবিতা প্রতিযোগিতার আসরে প্রেমচন্দকে নিয়ে রচিত একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন তিনি। সেই সময়ই তাঁর রচিত 'রামনামী চাদর' কবিতাটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুর পর গান্ধীজির মনঃস্থিতিকে অভিব্যক্তি করে একটি মুক্ত ছন্দের কবিতা তিনি ভাগলপুর জেলে থাকাকালীন রচনা করেছিলেন। যদিও এই কবিতাগুলো কোথাও প্রকাশিত হয়নি, তাই এদের কোনো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। রেণুর প্রথমদিককার কবিতাগুলো সাপ্তাহিক বিশ্বামিত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর মহত্বপূর্ণ কবিতা 'অপনে জিলে কী মিট্টি সে' দেশবিভাগের যন্ত্রণাপীড়িত মনঃস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে রচিত হয়। কবিতা ছাড়াও তাঁর রচিত একমাত্র গদ্যগীত 'ও লাল আফতাব' ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৪.৩ কাহিনিকার ফণীশ্বর রেণু

উপন্যাস রচনার বহু পূর্বেই ১৯৩৬ এর কাছাকাছি সময়ে গল্প লেখার সূচনা করেন রেণু। সেই সময়কার কিছু কিছু গল্প প্রকাশিতও হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল কিশোর রেণুর অপরিপক্ক রচনা। ১৯৪৪ সালে কারামুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে তিনি 'বটবাবা' নামক প্রথম সার্থক গল্প রচনা করেন, প্রকাশকাল ১৯৪৪ সাল। দ্বিতীয় গল্প 'পহলবান কী ঢোলক' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালেই। এবং ১৯৭২ সালে রচিত হয় তাঁর শেষ গল্প 'ভিত্তি চিত্র কী ময়ূরী'। তাঁর তিনটি গল্প সংগ্রহ 'ঠুমুরী' (১৯৫৯), 'আদিম রাত্রি কী মহক' (১৯৬৭), 'অগিনখোর' (১৯৭৪) ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা রেণুর সর্বমোট গল্পের সংখ্যা ৬৩ টি। বর্তমান তাঁর সমস্ত গল্পই রেণু রচনাবলি ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

রেণু রচিত এই সমস্ত গল্পগুলোকে মোটামুটি দুই শ্রেণিত বিভক্ত করা যেতে পারে। এক শ্রেণির অন্তর্গত করা যায় সেই গল্পগুলোকে, যার পটভূমি গ্রামাঞ্চল, এবং দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত করা যায় এমন গল্পকে যার পটভূমি রচিত হয়েছে পটনা ও মুম্বই-র মতো শহরাঞ্চলকে কেন্দ্র করে। শহর এবং গ্রাম উভয় অঞ্চলকেই পটভূমি হিসেবে বেছে নিলেও রেণুর মন অবশ্য গ্রামাঞ্চলেই নিবেশিত ছিল বিশেষ করে। তাঁর সমস্ত চর্চিত গল্প — 'তিসরী কসম', 'রসপ্রিয়া', 'লালপনা কী বেগম', 'পঞ্চলাইট', 'সংবদিয়া' ইত্যাদির পটভূমি গ্রামাঞ্চলই। আর 'টেবুল', 'আজাদ পরিন্দে', 'জলবা', 'লফড়া', 'অগিনখোর' — আদি শহর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা গল্পে রেণুর সেই সহজ রূপটি খুঁজে পাওয়া যায় না, যা রেণুর বিশেষত্ব।

শ্রেণিবিচারের দিক থেকে রেণু-র গল্পগুলোকে 'ঠুমরী ধর্মা' বলা হয়েছে। তাঁর প্রথম গল্প সংগ্রহের নাম 'ঠুমরী' হলেও এ নামের কোনো গল্প গ্রন্থটিতে ছিল না। গ্রন্থটির ভূমিকায় রেণু লিখেছিলেন, এই সংগ্রহে 'ঠুমরী' নামক কোনো গল্প নেই, সবগুলো গল্পই ঠুমরী ধর্মা। কেন-না, স্বল্পায়তনের শ্রুতিমধুর এই ঠুমরী গানে যেমন মূল রাগ একটিই

থাকে কিন্তু বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে গানটিকে অত্যধিক মোহক ও কলাত্মক করে তোলা হয়, তেমনি রেণুর গল্পগুলোতেও মানবীয় সংবেদনার মূলসূত্র একটাই। জীবনের ছোটো ছোটো প্রসঙ্গগুলোর সঙ্গে সেই মানবীয় সংবেদনার সংগতি সাধন ঘটিয়ে তিনি তাঁর গল্পগুলোকে এক সংশ্লিষ্ট আকার দান করেছেন। গল্পগুলি সংগীতের লয়ে অনুশাসিত হয়েছে। রেণু-রচিত কাহিনির এটাই নিজস্ব বিশেষত্ব।

নিজ গল্প সম্পর্কে রেণু বলেন— "আমার সাধারণ পাঠক আমার স্পষ্টবাদিতা ও সপাট বয়ানে সর্বদাই সন্তুষ্ট হয়েছেন আর সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত সাহিত্যিক-সমালোচকেরা সবসময়ই অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে এক জীবন-দর্শন হীন, অপদার্থ, অপ্রতিবদ্ধ, ব্যর্থ, রোমান্টিক প্রাণী প্রমাণিত করেছেন... সমস্ত জলাশয়ের জল নষ্ট করে দেওয়া জীব। তবুও কখনোও আমার দ্বারা এর থেকে বেশি বলা গেল না যে, আমার গল্পে আমি নিজেকেই খুঁজে ফিরি। নিজেকে অর্থাৎ মানুষকে"। (রেণু রচনাবলি, খণ্ড-১, পরিশিষ্ট ২) রেণুর গল্পের এটাই মূলসুর। তাঁর গল্পগুলোতে মানুষ নিজস্ব সহজ রূপে নিজ ভালো-মন্দ নিয়ে, আপন কর্মঠতা, সংঘর্ষশীলতা তথা ভাবুকতা, রসিকতা, সংবেদনশীলতা এবং কঠোরতা-কোমলতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেজন্যই তাঁর গল্পে কোনো ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়, সমাজ, পার্টি, বর্গ বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষ দেখতে পাওয়া যায় না। রেণু তাঁর প্রত্যেকটি চরিত্রকে পূর্ণ সহানুভূতি দান করেছেন, তাদের মনস্তত্ব-কে অনুধাবন করেছেন। পশু-পক্ষী, নদী-নালা, বৃক্ষ-বনস্পতি, সব কিছুর প্রতিই ছিল তাঁর পরম মমত্ববোধ। আর তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো সকলের মন ছুঁয়ে যায়। আমাদের চেতনাকে স্পন্দিত করে ও হৃদয়ে বিরাজিত হয়।

'রয়প্রিয়া' গল্পের পঞ্চকৌড়ি মিরদংগিয়া, 'সাবরিয়া'-র হরগোবিন্দ, 'তিসরী কসম'-এর হিরামন আর হিরাবাঈ, 'পঞ্চলাইট'-এর মুনরী, 'লালপান কী বেগম'-এর বিরজুর মা, 'নেয়ানাজ্যোগিন'-এর রতনা, 'প্রাণো মে ঘুলে রঙ'-এর মগহিয়া ডোম জাতের ভিখারী যুবতী, এমন কি 'তবে একলা চলো রে'-র কিসন মহারাজ (মোষ শাবক) এ সমস্ত চরিত্রই গল্পের মধ্যে ক্ষণিকের জন্য আবির্ভূত হয় আর চিরকালের জন্য পাঠকের মনে অমিত ছাপ রেখে যায়। এটা এজন্যই সম্ভব হয় কেন-না বহু সামাজিক বিকৃতি এবং ট্র্যাজিক পরিস্থিতিতে নিজ নিয়তির সঙ্গে লড়াই করেও এই চরিত্ররা নিজেদের মানব ও মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখে। এরা অসহায়, গরিব, অশিক্ষিত, পীড়িত, অন্ধবিশ্বাসী ও জড় হতে পারে কিন্তু মনুষ্যত্ব ও সংবেদনশীলতার দিক থেকে তথাকথিত সভ্য, নগর-মহানগরীর গণ্যমান্য মহাপুরুষদের থেকে নিশ্চয়ই বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তবে একথা মনে রাখা অবশ্যকর্তব্য যে, রেণুর মনে কারো প্রতি ঘৃণা বা দ্বেষ না থাকলেও শোষক, বঞ্চক ও ভণ্ড তথা কপট চরিত্রের প্রতি কোনোকালেই সহানুভূতি প্রদর্শন করেননি তিনি। আর সেজন্যই শ্রী যশপাল, অজ্ঞেয়, রাজেন্দ্রযাদব, কমলেশ্বর, নির্মল বর্মা, ভীষ্ম সহানি, রামদরশ মিশ্র আদি বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা রেণুকে এক শ্রেষ্ঠ কথাকার রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন।

৪.৪ রেণুর ভাষাশৈলী

ফণীশ্বরনাথ রেণুর ভাষাশৈলী সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেছেন— "ফণীশ্বরনাথ কাহিনীকারের শৈলী হল রেণু-শৈলী, যাতে ধূলিকণার চূর্ণতা ও পুষ্প-পরাগের সৌরভ দুই-ই নিহিত আছে।" ছোটো ছোটো বাক্য, সরল, সরস, দৈনিক জীবনের লোকগীতির মতো মধুর শব্দ যা তৎসম শব্দের অতিরিক্ত আড়ম্বের এবং সামাজিক বঞ্ঝাটের জটিল প্রপঞ্চ থেকে মুক্ত থাকে। তাঁর বাক্য জীবের মতো বাঁচে ও ফুলের মতো গন্ধ ছড়ায়। আর তাঁর ব্যঙ্গ যদি বিশুদ্ধ করে, তবে তা মাছের কিংবা গোলাপের কাঁটার মতো। রসপ্রিয়া, আদিম রাত্রি কী মহক, তিসরী কসম, লাল পান কী বেগম, সংবদিয়া-তে এমনি হয়েছে। জলবা এবং আত্মসাক্ষী-তেও হাসির পাশাপাশি চোখের জল গোপন করা কচকচানিও আছে। অগিনখোর এবং বৃত্তচক্র-তে নিঃসংশয়ভাবে ব্যঙ্গের শৈলী কিছু কর্কশ ও বিদ্রূপ আকৃতি গ্রহণ করলেও আকৃতিটাই এমন, তবে রস এবং প্রতীক ভাব কখনও ত্যাগ করে না। রেণুর ভাষা শৈলীর সর্বত্রই এক সহজতা বিরাজ করে। যেমন অগিনখোর গল্পের ভূমিকা মদির শৈলীতে, পূতগন্ধময় উপসংহারও সরল শৈলীতে, আবার মধ্যাংশের উত্তর-প্রত্যুত্তর বৈদগ্ধ্যতা ও সহজ-সরল বার্তালোপের মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়েছে। ভাষা শৈলীর স্বচ্ছতা ও অকৃত্রিমতা উপন্যাসের চাইতে তাঁর গল্পগুলোতে অধিক লক্ষ করা যায়।

ছায়াছবির মতোই রেণুর সাধারণ বাক্যেও প্রত্যক্ষতার সঙ্গে ধ্বনির এমন মেলবন্ধন ঘটেছে যে, দৃশ্যকে একই সঙ্গে গোচর এবং সজীব করে তুলেছে। যেমন—

"এ! বুঢ়ে মিরদঙ্গিয়া নে চৌকতে হুয়ে কহা— রসপিরিয়া? ... হাঁ... নহী। তুমনে ক্যায়সে... তুমনে কহাঁ সুনা বে?... খেতো মেয়দানো, বাগ-বাগিচে ঔর গায়-ব্যয়লো কে বীচ চরবাহা মোহনা কী সুন্দরতা।"

(এ্যা! বুড়ো মিরদঙ্গিয়া চমকে উঠে বলল— রসপিরিয়া?... হা... না। তুমি কেমন করে... তুমি কোথায় শুনলে 'বে'?... ক্ষেত, ময়দান, বাগ-বাগিচা আর গরু-মোষের মাঝখানে রাখাল ছেলে মোহনের সুন্দরতা।) অথবা, "মিরদঙ্গিয়া কে মুঁহ সে নিকল পড়া-অপরূপ-রূপ।")

প্রথমে 'এ্যা' বলে চমকে ওঠা, তারপর 'হা', আবার 'না' বলা, আগে তুমি ও পরে 'বে' সম্বোধন করে থমকে যাওয়া এক দৃশ্য—শ্রব্য রূপ ছায়াছবিই যেন নির্মিত হয়েছে। এমন উদাহরণ তাঁর প্রত্যেকটি গল্পেই প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। বিস্ময় চিহ্ন এবং অব্যক্ত সংকেত-বিন্দুর তো যেন জাল বিছিয়ে দিয়েছেন বেণু তাঁর গল্পে। বিস্ময় এবং অব্যক্ত ব্যঞ্জনার এই সংকেত চিহ্ন ও বিন্দুর প্রয়োগ করে রেণু বিস্ময় ভাব তথা অনুভূতির আতিশয্যের মুক অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেন। সরল-সাধারণ গ্রাম্য ব্যক্তির জীবনে যখন অকস্মাৎ অসাধারণের স্বর্গোদয় হয়, তখন সে স্তব্ধ হয়ে পড়ে যা নিতান্তই স্বাভাবিক। ঘটনার অভিঘাতে তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব, সমগ্র চেতনা যেন জড়ীভূত হয়ে যায়। চেতনা বা অনুভবের এই জড়তার স্তব্ধতাই তাকে মূক করে দেয়। যেমন তিসরী কসমের

সুগন্ধে অবগাহন-রত গাড়োয়ান চম্পা ফুল, পরী, দেবতা-দেবী, শিহরণ, পুলকের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে এক অদ্ভুত পীড়ায় গ্রস্ত হয়, আবার সেই পীড়া তাকে মূক করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে রেণুর এই বিশেষ শৈলী স্তব্ধতাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সহায়ক হয়ে ওঠে।

লাল পান কী বেগম, অগিনখোর, বৃত্তচক্র ইত্যাদি গল্পে ঝগড়া, লাস্য, পাঁয়তারা, শ্বাসরুদ্ধকর বেদনা, অস্থিরতা এবং প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন চলাকালীন এই চিহ্নগুলোর কেবলমাত্র প্রয়োগ নয়, উপযুক্ত ব্যবহার হয়েছে। প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের ক্ষেত্রে যখন এদের ব্যবহার হয়, তখন সেখানে ব্যাকরণের আবশ্যকতাও অধিক হয়। রেণু ধ্বনির এক শতাংশ সাদৃশ্যের জন্যও পদ এবং বাক্যকে খণ্ডিত করেছেন। এ কোনো সরগমের মাস্টারি নয়, বরং এ হল সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও দৃশ্য-শ্রব্য তাৎকালিক এক সাহিত্যিক ধর্ম। পাঠক যাতে চোখে দেখার, কানে শোনার অনুভব লাভ করে তারই প্রচেষ্টা। যার ফলে মনে হয়, কেউ শুধু কাহিনি বলছেই না একই সঙ্গে দেখাচ্ছে এবং শোনাচ্ছেও। ফলস্বরূপ, মঞ্চ এবং নেপথ্য দুই-ই রেণুর শৈলীতে উচ্চকিত ও ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

এছাড়াও এই কাহিনিগুলোর শৈলীতে ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রায় আদ্যোপান্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

"ফিরে তকিয়ে পর কেহুনী ডালকর ঝুক গয়া, ঝুকতা গয়া। খুশবু উসকী দেহ মে সমা গয়ী। তকিয়ে কে গিলাফ পর কঢ়ে ফুলো কো উংগলিও সে ছুকর উসনে সুংঘা, হায়, রে হায়! ইতনী সুগন্ধ। হিরমান কো লগা একসাথ পাঁচ চিলম গাঁজা ফুঁক কর বহ উঠা হেয়।"

(তারপর তাকিয়ায় কনুই চেপে ঝুঁকে গেল, ঝুঁকতেই থাকল। সুগন্ধ তার দেহে প্রবেশ করল। তাকিয়ার ওয়াড়ে সেলাই করে ফুটিয়ে তোলা ফুলগুলোকে আঙুলে ছুঁয়ে সে ঘ্রাণ নিল, হায়, রে হায়! এ তো সুগন্ধ। হিরামনের মনে হলো একসাথে পাঁচ ছিলিম গাঁজা খেয়ে উঠল সে।)

এই ইন্দ্রিয়ানুভূতি কখনো কখনো আত্মার রহস্যময় জীবনের আভাসও দিয়ে যায়— "ধরতী বোলতী হেয়। গাছ-বিরিচ্ছ ভী অপনে লোগো কো পহচানতে হেয়। ... ফলস কো নাচতে-গাতে দেখা হে। কভী? রোতে সুনা হে কভী অমাবস্যা কী রাত কো?"

(ধরিত্রী কথা বলে। গাছ-বৃক্ষও নিজের লোক চিনতে পারে। ... ফসলকে নাচতে-গাইতে দেখেছো। কখনোও? কাঁদতে শুনেছো কখনো অমাবস্যার রাতকে?)

আবার ইন্দ্রিয়ানুভূতি যেখানে প্রতীকধর্মী হয়ে ওঠে তার উদাহরণ—

"মুড়ী হুয়ী গরদন, দুধ কী তরহ সফেদ ড্যানে, গুলাবী চোঁচ... হাজারো হাজার বত্তখে ... পেঁক ... পেঁক ... পেঁক ... পেঁক ... পেঁক ... পেঁক ... পেঁক করতী হুয়ী অস্পাতাল কী ঔর মুড় গয়ী। গঙ্গা কে ইস পার সে ওস পার তক বত্তখো কা এক পুল বন গয়া। নীল জল পর সফেদ পুল...।"

(বাঁকানো গ্রীবা, দুধ সাদা ডানা, গোলাপী ঠোঁট ... হাজার হাজার হাঁস... প্যাক...প্যাক...প্যাক...প্যাক করতে করতে হাসপাতালের দিকে মোড় নিল। গঙ্গার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত হাঁসেদের একটা পুল তৈরি হয়ে গেল। নীল জলের উপর সাদা পুল।)

এধরনের ইন্দ্রিয়ানুভূতি গদ্যে কাব্যরসের এমন সৌরভ আনয়ন করে সে প্রসঙ্গে এবং চরিত্রের অনুভূতি আরও তীব্র ও ঘনীভূত হয়ে চলে।

তবে ফণীশ্বরনাথ রেণুর গদ্য-শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট হল, স্মৃতিমেদুরতা বা মোহাবসাদ। শৃঙ্গারের মাধুর্য এবং উল্লাস-এর পাশাপাশি পাঠকের অভ্যন্তরকে দাহ ও করুণা নিমজ্জিত করে চলা তাঁর গদ্য-শৈলীর যেন স্বভাব। অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে বর্তমানের বৈষম্যকে দেখিয়ে এমন এক বাতাবরণের সৃষ্টি করেন যে, পাঠান্তে ব্যঙ্গের অনুভূতি তীব্র হয়ে ওঠে না, বরং সহানুভুতির চাপান-উতোর মুখ্য হয়ে ওঠে। এই মোহাবসাদের রসনিষ্পত্তির জন্য তিনি স্মৃতি, বিস্ময়, বিষাদ, আক্রোশ ইত্যাদি ভাব, চমকানো, বেদনাকে আচ্ছাদিত করা বিনোদ-বার্তা, প্রকৃতির সরস এবং নীরস দৃশ্যাবলি এবং কাব্যিক সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার মতো উদ্দীপনের ব্যবহার করেন। রসপ্রিয়া, তিসরী কসম ইত্যাদি গল্পে এদের বিশেষ মহিমা লক্ষ করা যায়।

আবার কখনো কখনো গল্পের মাঝখানে লঘু প্রসঙ্গ, উপকথা, যেমন— তিসরী কসমে মধুয়া ঘাটোয়ারীনের কথা, অজোধাদাসের প্রসঙ্গ, রসপ্রিয়া-তে মস্তরাম বাবার কাহিনির উল্লেখ। অথবা লোকগীত, যাত্রা-থিয়েটারের প্রচলিত সুর এবং বিদ্যাপতির পদাবলিতে এমনভাবে গল্পে গেঁথে দেন যে, গল্পের মালায় সুগন্ধের বাহার আসে এবং গল্পে ব্যবহৃত গীত ভ্রমর-গুঞ্জনের মতো মদির ও মধুময় হয়ে ওঠে।

৪.৫ রেণুর ছোটোগল্পে আঞ্চলিকতা

আঞ্চলিক কথাসাহিত্যের প্রধান বিশেষত্বই হল এই যে, এখানে কোনো ব্যক্তিবিশেষকে নয়, সমগ্র একটি অঞ্চলকেই পাত্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে। এই জাতীয় রচনায় চরিত্ররা বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করলেও নিম্নবর্গের পাত্ররা একমুহূর্তের জন্যও আত্মমর্যাদা হারায় না। এরা অভেদ্য নয়, কিন্তু অজেয়। এ-জাতীয় রচনায় আরো একটি জিনিস লক্ষ করা যায় যে, প্রাচীন অথবা সনাতন আস্থা ও সাংস্কৃতিক স্তরের মন্থর জীবনে যখন আধুনিক সভ্যতার প্রবেশ ঘটে, তখন পূর্বজের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরম্পরা, লোকাচার, আর্থিক ব্যবস্থা, নৈতিক মূল্যবোধ, নর-নারীর সম্পর্ক ও প্রেম সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণায় এক ভাঙন দেখা দেয়। এমন ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সনাতনবাদীরা শান্ত-সমাহিত দৈনিক জীবন কায়েম রাখতে সক্ষম হলেও কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যারা অসীম ক্রিয়া এবং অক্ষয় পুরুষার্থের প্রতীক হয়ে উঠেন।

আঞ্চলিকতায় জন-জীবনের সমগ্রতা বর্তমান থাকে, থাকে মাটির সুগন্ধ। লোক ভাষা, লোকগীত আদির পাশাপাশি যথার্থ গ্রাম্যজীবনও স্থান পায় আঞ্চলিক কথাসাহিত্যে। অঞ্চলবিশেষের পরিস্থিতি ও সমস্যার চিত্রণও অত্যন্ত প্রভাবোৎপাদকভাবে উপস্থাপিত করা হয়। আঞ্চলিক ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাস এবং গল্পগুলোতেও এই বৈশিষ্ট্যগুলিও লক্ষ করা যায়।

তিসরী কসম গল্পে সীমার ওপারের মোরঙ্গ, রাজনেপাল বা ফারবিসগঞ্জ, জোগবনী তথা বিরাটনগরের কথা বলা হয়েছে। তরাই-র ঘন জঙ্গল এবং নদী-নালা অতিক্রম করার কাহিনির উল্লেখও আছে, তবে আঞ্চলিকতার মূল সুর পাওয়া যায় গল্পের প্রারম্ভে, চোরা-কারবারের নাটকীয় বিবরণে, মুনিমজির পেটে খোঁচা মারতে মারতে দারোগার দেওয়া গালি ও পৈশাচিক হাসির মধ্যে। একইভাবে বাঁশ বোঝাই সংক্রান্ত দ্বিতীয় শপথ থেকে আঞ্চলিকতার তন্তু-জাল নির্মিত হতে থাকে।

ব্যবসায় সংক্রান্ত দৈনিক এবং ছোটো-ছোটো নিতান্ত পরিচিত বিবরণ থেকেই অনুমান ও উপচার দ্বারা আঞ্চলিকতার ছায়া-সৌন্দর্য কুয়াশার মতো ফুটে উঠতে থাকে। ছোটো ছোটো বিবরণ যেমন— বাঁশের প্রান্তভাগ ধরে হেঁটে চলা ভাড়াটের পেটুক পরিচারক অথবা গরুর গাড়ি ও ঘোড়া-গাড়ির পরস্পর সংঘর্ষের উল্লেখই ফারবিসগঞ্জ বা মোরঙ্গ অঞ্চলের জীবনে প্রাণের সঞ্চার করে। বিবরণের পর বিবরণ জুড়তে থাকে। সার্কাস কোম্পানির বাঘকে গরু-গাড়িতে বহন করায়, গাড়োয়ানের দলের পটাপট হাততালি দেওয়ায়, বাঘের গন্ধ থেকে বাঁচতে সেঠজির নাকবন্ধন লাগানোয়, ইত্যাদি কিছুটা রোমাঞ্চকর ও অসামান্য অনুভবের সাহায্যে অঞ্চলটির শহুরে ভাবটিকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে একলা চলো রে— গল্পটিতেও টুনুক সাহ তথা সমস্ত গ্রামবাসীরা যখন কিসন মহারাজকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে— শিং-এ ঘি লাগায়, মাথায় ফুল-দুর্বা দেয়, তখন আঞ্চলিক রীতি-নীতির উপরই আলোক সঞ্চার করা হয়। অথবা বটবাবা গল্পে যখন একটি বটগাছকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীর বিশ্বাস, সংস্কারের উল্লেখ করা হয়, বা একাদশী, পূর্ণিমা আদি পরবের দিনে সিঁদুর-চন্দন-বেলপাতা-ধূপ-দীপ-পান-সুপারি সহযোগে গাছের পুজো সম্পন্ন করার কথা উল্লিখিত হয়, তখন একটি অঞ্চলের আবহমান কাল থেকে চলে আসা পরম্পরা ও লোকাচার ইত্যাদিকেই মূর্ত করে তোলা হয়। আবার রসপ্রিয়া গল্পে আধুনিক যুগের আগমনে লাঞ্ছিত, অবহেলিত বিগত যুগের এক মৃদঙ্গ-বাদকের বেদনাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে অঞ্চলবিশেষের লোক-গান, লোক-নৃত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটান লেখক।

ফণীশ্বরনাথ রেণুর বৈশিষ্ট্যই এই যে, বিশেষ একটি অঞ্চলের আত্মা, মন এবং বাসনাকে প্রত্যক্ষ করানোর অভিপ্রায়ে চরিত্র হিসাবে তুলে ধরেন সহজ-সরল অতি সাধারণ মানুষকে, আর অনায়াসে তাঁর গল্প-উপন্যাসে ব্যবহার করেন লোক-গীত, লোক-কাহিনি, আচার-বিশ্বাস ও উপভাষাকে।

ফলসরূপ আমরা দেখা পাই তিসরী কসম গল্পে হিরামনের মতো এমন এক চরিত্রের যে সাত বছর ধরে গরু-গাড়ি চালাচ্ছে, মেলাতেও সওয়ারি আনা-নেওয়া করে, কিন্তু নাটক-থিয়েটার, বায়োস্কোপ-সিনেমার মুখ পর্যন্ত দেখেনি। আর সেই হিরামনের গাড়িতেই যখন নাটক কোম্পানির নর্তকী হিরাবাঈ সওয়ারি হয়, তখন তার অনুভূতি অঞ্চলটির সমস্ত সুষমা, সমস্ত রহস্যকে যেন শব্দের মাধ্যমেই প্রকাশ করে। যেমন— "গাড়ী জব পুরব কী ঔর মুড়ী, এক টুকড়া চাঁদ উসকী গাড়ী মে সমা গয়া। সবারী কী নাক পর এক জুগনু জগমগা উঠা... সামনে চম্পা নগর সে সিন্ধিয়া গাঁও তক ফ্যায়লা হুয়া ম্যায়দান....কহী ডাকিন-পিশাচিন তো নহী?" (গাড়ি যখন পূর্ব দিকে মোড় নিল, এক টুকরো চাঁদ তার গাড়িতে প্রবেশ করল। সওয়ারির নাকে একটি জোনাকি ঝিলমিল করে উঠল... সামনে চম্পা নগর থেকে সিন্ধিয়া গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা ময়দান...কোনো ডাইনি-পিশাচিনী নয় তো?)

কিন্তু খানিক পরেই হিরামন অনুভব করে— আরে বাবা! এ তো পরী।

এক টুকরো চাঁদ, জোনাকি, ছড়িয়ে থাকা ময়দানের অস্পষ্টতা, ডাইনি-পিশাচিনী এবং পরী জাতীয় সংস্কার আর বিস্মিত গ্রাম্যতা দিয়েই একটি অঞ্চলের ছায়াসৌন্দর্য প্রস্তুত করা হয়। কখনো কখনো অঞ্চলের সমস্ত রোমান্স গ্রাম্য-মানুষের মুখে ব্যবহৃত অকৃত্রিম উপমানের ভেতরই নিবেশিত থাকে। যেমন— "নাক কী নক ছবি কে নগ দেখ কর সিহর উঠা— লহু কী বুঁদ"। নাকছাবিকে রক্ত-বিন্দুর উপমা দানে যথার্থই রোমান্সের সৃষ্টি হয়েছে এখানে। আবার কখনো কখনো এধরনের রোমান্স কিছু নাম, সময় এবং জীবনচর্যার চর্চাতেও ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, কাজরী নদীর কিনারে কিনারে তেগাছিয়ার পাশে গাড়ি দাঁড় করানো, বা জটামাঁসি গাছের উল্লেখ, যার গন্ধ দুই ক্রোশ দূর থেকে পাওয়া যায়, আর যা খাম্বীরা তামাকে মিশিয়ে সেবন করা হয়।

বিশেষ একটি অঞ্চলের মাধুর্য তখনই লাভ করা যায়, যখন কথাকে রসে সিক্ত করা হয় অর্থাৎ অতীতের স্মৃতিকে যখন 'আহ' তে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নামলগর দেউড়ির যুগের চর্চা, এবং পরিশেষে 'যা রে জমানা' বলে ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাস— হারিয়ে যাওয়া যুগের প্রতি মোহ জাগিয়ে তোলে। রসিয়ে গল্প বলার কুশলতা একদিকে যেমন সরল ও রসিক দেহাতির ছবি ফুটিয়ে তোলে, তেমনি অপরদিকে সম্পূর্ণ অঞ্চলকে গুণসমৃদ্ধ করে তোলে। আর গল্পে আঞ্চলিক শব্দ ও লোকগীতির ব্যবহারও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। যেমন— গুজুর গুজুর, মিরতু, সাহেব, লাটনী, ডেম-ফেট-লেট, সরোসতী মাইয়া, সজনোয়া বৈরি হো গয়ে হমারো ইত্যাদি। রসপ্রিয়া গল্পে বারোমাস্যা, বিরহা, চাঁচর, লগনী ইত্যাদি লোকসঙ্গীতের উল্লেখ, বিদ্যাপতির পদাবলির ব্যবহার, রসপ্রিয়া গান—

"অরে, চলু মন, চলু মন-সসুরার জইবে হো রামা,

কি আহো রামা,

নেহিরা মে আগিয়া লগায়ব রে-কী....।"

অথবা উপভাষার সার্থক প্রয়োগ, যেমন— "মাঁ ভী কহতী হেয়, হল্দী কী বুকনী কে সাথ রোজ গরম পানী। তিল্লী গল জায়েগী"। (রসপ্রিয়া)।

"হে দিনকর সাচ্ছী রহনা। মিরদঙ্গিয়ানে ফুসলাকর মেরা সর্বনাশ কিয়া হেয়"। (রসপ্রিয়া)।

"একবার উপলৈন মে লাটসাহেব ময় লাটনী কে হাওয়াগাড়ী সে আয়ে থে"। (তিসরী কসম)।

"কান চুনিয়া কর গপ্প সুননে সে হী তীস কোস মঞ্জিল কটেগী ক্যা"? (তিসরী কসম)।

একটি বিশেষ অঞ্চলকেই তার রূপ-রস-গন্ধসহ আমাদের সম্মুখে মূর্ত করে তোলে।

৪.৬ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে গল্পকার ফণীশ্বরনাথ রেণুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর ছোটোগল্প সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা। এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে কাহিনিকার ফণীশ্বরনাথ রেণু গল্পকার হিসেবে সার্থকতা ও তাঁর গল্পের সার্থকতার আলোচনা, রেণুর ভাষাশৈলী এবং তাঁর ছোটোগল্পে আঞ্চলকতার বৈশিষ্ট্য।

৪.৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (**Sample Questions**)

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৪.৮ প্রসঙ্গ-পুস্তক (**References/Suggested Readings**)

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

* * *

বিভাগ-৫

ফণীশ্বরনাথ রেণুর ছোটোগল্প সংকলন

ফণীশ্বরনাথ রেণুর ছোটোগল্প সংকলন : নির্বাচিত গল্পের আলোচনা

বিষয় বিন্যাস

৫.০ ভূমিকা (Introduction)

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

৫.২ নির্বাচিত গল্পের পরিচিতি

- ৫.২.১ তৃতীয় শপথ (তিসরী কসম)
- ৫.২.২ এক আদিম রাত্রির সুবাস (এক আদিম রাত্রি কী মহক)
- ৫.২.৩ ইতিহাস, ধর্ম আর মানুষ (ইতিহাস, মজহব ঔর আদমী)
- ৫.২.৪ ভিত্তিচিত্রের ময়ূরী (ভিত্তিচিত্র কী ময়ূরী)

৫.৩ নির্বাচিত গল্পের চরিত্র বিচার

- ৫.৩.১ হিরামন (তিসরী কসম)
- ৫.৩.২ হিরাবাঈ (তিসরী কসম)
- ৫.৩.৩ করমা (এক আদিম রাত্রি কী মহক)
- ৫.৩.৪ মনমোহন (ইতিহাস, মজহব ঔর আদমী)
- ৫.৩.৫ ফুলপত্তি (ভিত্তিচিত্র কী ময়ূরী)

৫.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৫.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

৫.৬ প্রসঙ্গ-পুস্তক (References/Suggested Readings)

৫.০ ভূমিকা (Introduction)

ফণীশ্বরনাথ 'রেণু' হিন্দী কথাসাহিত্যের এক বহুচর্চিত এবং পরিচিত নাম। রেণুর ব্যক্তিত্ব ছিল বহুমুখী, একাধারে তিনি ছিলেন সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিজ্ঞ ও সাহিত্যিক। তিনি তাঁর পাঁচটি উপন্যাস এবং পাঁচটি গল্প সংগ্রেহে যে গ্রামীণ জীবনের চিত্রণ করেছেন তা মূলত মুন্সী প্রেমচন্দের পরম্পরা বাহিত হলেও গ্রামীণ জীবন, গ্রাম্য ভাষা, পরিবেশ ও লোকচার, বিশ্বাস-কে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়ে হিন্দী আঞ্চলিক উপন্যাসের জনক হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। তাঁর রচিত গল্পেও এই আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখা যায়। উপন্যাস রচনার পাশাপাশি গল্প রচনাতেও তিনি দক্ষতা অর্জন করে সমালোচকের সমাদর লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন।

৫.১ উদ্দেশ্য (Objectives)

চতুর্থ ষাণ্মাসিকের দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ বিভাগে আলোচিত হয়েছে — "ফণীশ্বরনাথ রেণুর ছোটোগল্প সংকলন : নির্বাচিত গল্পের আলোচনা"। এই বিভাগ থেকে আপনারা রেণু নির্বাচিত গল্পগুলির কাহিনি-সংক্ষেপ, বিষয়বস্তু ও চরিত্রগুলি সম্পর্কে অবগত হবেন।

৫.২ নির্বাচিত গল্পের পরিচিতি

এবার আমরা ফণীশ্বরনাথ রেণুর নির্বাচিত ছোটোগল্পের আলোচনা শুরু করব।

৫.২.১ তৃতীয় শপথ (তিসরী কসম)

এই গল্পটি সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক সুরেন্দ্র চৌধুরী বলেছেন— "তিসরী কসম... নাটক, গল্প, গদ্য! এখানে যেন জীবনের গান বয়ে যাচ্ছে ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে।" তবে এ গান ক্লান্ত হৃদয়ের গান। এই গান অকারণে বেরিয়ে আসে না, একটি বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা জন্ম নেয়। হিরামনের এই কাহিনি নিজেকে লুকিয়ে রাখা এক বিষাদঘন মুহূর্তের মাঝখানে রচনা করে গভীর উল্লাসপূর্ণ সহবাসের টানাপোড়েনের এক বুনোট। ওটি এমনই এক ভালোবাসার আলো-ছড়ানো কাহিনি, যে গল্পের মধ্যে উবে যায় জীবনের অনেক উৎপীড়ন আর অত্যাচার। তিসরী কসমের তিনটি প্রতিজ্ঞার বাধা নিষেধও এই মনোরোগ ও মানস-দীপ্তিকে চূর্ণ করতে পারে না।

তবে গল্পে যদি কেবলমাত্র মানসিক পরিমণ্ডলের নাটকীয়তেই থাকত তাহলে হয়ে উঠত নেহাতই একটা বোঝার মতো। কিন্তু ওই মানসিক পরিমণ্ডলটি তার সহজ সংযোগের কারণেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই গল্পের মধ্যে নেই কোনো প্রতীকধর্মী জটিলতা, নেই অন্তর্নিহিত বাতাবরণের রহস্যময় কোনো টানাপোড়েন। আপন চিত্রময়তা, নাটকীয়তা এবং বিষণ্ণ প্রভাব সঞ্চারের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি রেণুর বিশিষ্ট এবং প্রতিনিধিস্থানীয় একটি গল্প।

নিজের অজ্ঞতা এবং তার সহযোগীদের সরলতা-তাড়িত হিরামন নিজে থেকেই তৃতীয়বার মেনে নেয় তার শপথের বাধা-নিষেধকে। তবে প্রথম দুটি শপথের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতিতে উচ্চারিত হয়েছে তার তৃতীয় শপথটি।

প্রথম শপথের বিষয়টি ছিল বিপজ্জনক। কন্ট্রোলের যুগ, চারবার সিমেন্ট ও কাপড় বোঝাই গাড়ি জোগবনী থেকে নেপালের বিরাটনগর পাচার করার পর পঞ্চমবার তার গাড়ি ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। উপায় না পেয়ে গাড়ি থেকে বলদদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল হিরামন। তারই অঞ্চলের ঘন জঙ্গলে নদী-নালা পার করে রাত ভর ছুটে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল সে। ঘরে পৌঁছে দু-দিন বেহুঁশ পড়ে থাকার পর তৃতীয় দিন জ্ঞান ফিরতেই কান ধরে কসম খেয়েছিল, চোরবাজারি মাল আর কোনোদিন নয়। হিরামনের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার বিষয়টিও কম আকর্ষণীয় নয়। বাঁশ বোঝাই গাড়ি নিয়ে শহরের রাস্তা দিয়ে

যাবার সময় মেয়ে-স্কুলের সামনে এসে তার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এই দুর্ঘটনার কথা মনে পড়লেই হিরামনের শরীরে কাঁপুনি দেখা দেয়। অতএব সে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করে বসে, জীবনে আর কোনোদিন গাড়িতে বাঁশ বোঝাই করবে না।

তারপর একবার সার্কাসের বাঘের খাঁচা-গাড়িকে বয়ে নিয়ে যাবার কাজেও লাগিয়েছিল সে তার গরুর গাড়িকে। কিন্তু আজকের মতো অনুভূতি তো আগে কখনোও হয়নি। এবারের মেলায় ভাড়া খাটতে এসে সওয়ারি পেয়েছে সে এক নারীকে। গাড়ি হাকতে হাকতে বছর চল্লিশের বিপত্নীক হিরামন ভাবে, এ কোনো নারী না চম্পা ফুল! তখন থেকে গাড়ি সুগন্ধে আমোদিত হচ্ছে। হিরামনের সওয়ারি আর কেউ নয়, মেলায় আসা নাটক-কোম্পানির নর্তকী হিরাবাঈ। পথ চলতে চলতে কথায় কথায় বন্ধুত্ব হয়ে যায় দুজনের।

হৃষ্টপুষ্ট, কুচকুচে কালো দেহাতী যুবক হিরামন, যার আপন গাড়ি আর বলদ ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো বিষয়েই বিশেষ আগ্রহ নেই। সেই কিন্তু হিরাবাঈ-র সম্পর্কে আগ্রাহান্বিত হয়। হিরাবাঈ-এর মধ্যে সে খুঁজে পায় তার মনের মিতাকে। তারপর কখনো গল্প শুনিয়ে, কখনো লোকগীতি শুনিয়ে এক স্বপ্নময় যাত্রার অংশীদার হয় সে। এই মেলায় এসে তার মনের মিতাকে পেয়ে সব কিছু হারিয়ে বসেছে হিরামন। কিন্তু যত বেশি এই মিতার সাহচর্য পাচ্ছে, ততই তো আরো বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে সে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। উল্টো বিশ্বাসে মনকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছে হিরামন— কোম্পানির মেয়েলোকটি তো কোম্পানিতেই গেছে। এখন তার সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্কই বা কিসের। কিন্তু এই অপর জনের সুখ তো অন্য কারো সুখ নয়, এ একান্তই হিরামনের নিজস্ব সুখ।

রাতের জোৎস্নায়, দিনের রৌদ্রতাপে গ্রামের যাত্রা কাহিনির মতো চলতে থাকে গল্প। আর সেই চলতে থাকা লোকজীবনের মধ্য দিয়ে চলা উন্মুক্ত পথে চলার মতো— "এই যাত্রায় আছে রস। এই চলায় যেমন আছে কথা-র রস তেমনি আছে উপভোগের আনন্দ-রসও। এ গল্প কোনও রূপকথা নয়, বাস্তবিকই হিরামনের গাড়িতে আছে তার মিতা। তার পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়া গন্ধ তার পুরো অস্তিত্বটাকে জড়িয়ে ধরে এই ঘটনাটির সঙ্গে। ইসস কাঁঠালীচাঁপা...।"

এই যে ইন্দ্রিয়বোধ, এ তো তার বিশ্ববোধেরও অংশ। আর হিরামনের বিশ্ববোধ তো কোনও বই থেকে পাওয়া নয়— এই বিশ্ববোধ তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত নিরক্ষরদের মধ্যে একই রকম। অক্ষর যেমন ধ্বনিকে আশ্রয় করে থাকে, তেমনি থাকে গন্ধ এবং স্পর্শেরও ভিতরে। মনের ভাষা তো প্রকাশ পায় এ সব কিছুর সঙ্গে মিলেমিশে, একইসঙ্গে। হিরামনের ওই যাত্রা অদৃশ্য স্পর্শের আত্মীয়তাকে যেন পৌঁছে দেয় পাঠকের মনের গভীরে। হিরামনের নবজাগ্রত অনুভূতি তার মনে যে সুখের সঞ্চার করেছে, তার ভিতরে রয়েছে এক গভীর স্তব্ধতা। আর এই স্তব্ধতা আছে বলেই তার বুকের ভিতরে লুকিয়ে রাখা আবেগেরে আতিশয্যে যদি নিজে ব্যর্থও হয় হিরামন, তবুও তার ওই সুখ কিন্তু তার

অখণ্ড নিটোল একটি সুখ হয়েই থাকবে। হিরামনের এই ভাবুক অনুভূতির মধ্যে নেই কোনও আত্মকরুণা।

আপন ভাবনার একান্ত হিরামন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় তার মিতাকে। এই আত্মীয়তার ফলেই এক বিধুর মানসিক অবসাদে ভরে যায় তার মন। তবে দীপ্তির উদ্ভাসে অনেক বেশি সহজ ও বরণীয় হয়ে যায় এই অবসাদ। আর অনুরাগের আলোয় ভরা এই যাত্রার সমাপন ঘটে এক মেলার জগতে, এক নাটকের জগতে। গ্রামীণ সমাজের গাড়োয়ান আবার ফিরে আসে তার নিজের জগতে। লালমোহর, পলটদাস, ধুন্নীরামের উপস্থিতি বদলে দেয় পারিপার্শ্বিক দৃশ্যপট। এখন স্বগত সংলাপের ভাষাও বদলে যায় আদালতের বুলিতে। কিন্তু মেলার দুনিয়ায় তার নিজের মিতার সঙ্গে কি হিরামন মেলার ভাষাতেই কথা বলবে?

না, কোনও শস্তা চটকদারি ব্যবসায়িকতা থাকা সম্ভব নয় তার মিতার মধ্যে। হিরামন তা কল্পনাও করে না। কিন্তু তবুও সে তার মিতাকে ধরে রাখতে পারে না, তার আপন মিতাকে ছেড়ে দিতেই হয় ব্যবসাদারের হাতে। রেলগাড়ি হিরাবাঈকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম খালি করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিরামনের দুনিয়াটাকেও যেন খালি করে চলে গেল। বাজার সর্বস্ব এই দুনিয়া এভাবেই প্রয়োজনমাফিক কিনে নেয় মানুষকে। শক্তসমর্থ পুরুষ, চাকর, শ্রমিক এবং নারী— সকলেই তো বাজারি মাল! তাই যেতে যেতে হিরাবাঈ-র মুখ থেকে নির্গত হয় এই সত্যটি, "কি মিতা?... মহুয়া ঘাটোয়ারিনকে সওদাগর কিনে নিল যে।" এই তো হল সময়ের প্রভুত্বের এক প্রভাববিস্তারী ছবি। আর এই সময়ের বুকে দাঁড়িয়েই হিরামন উচ্চারণ করে তার তৃতীয় শপথটি— "কোম্পানির মেয়েমানুষের সওয়ারি...।"

'তিসরী কসম'-এর রোমান্স এক গভীর অর্থময় বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় আমাদের। জটিল চিন্তাভাবনার বাঁধনে বাঁধা যে সব মানুষজনেরা লোকজীবনের রোমান্সকে অস্বীকার করেন, এই কাহিনিটি অনেক কিছুই উন্মোচিত করে দেয় তাদের সামনে। আর গীতিধর্মিতা ও নাটকীয়তার মেলবন্ধন এই গল্পটিকে এক অন্য মাত্রা দান করে।

৫.২.২ এক আদিম রাত্রির সুবাস (এক আদিম রাত্রি কী মহক)

এই গল্পটি 'আদিম রাত্রি কী মহক' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এই গ্রন্থটি ১৯৬৭ সালে প্রাকাশিত হয়। রেণুর লেখা কাহিনি বা গল্প আঞ্চলিক জীবনেরই গল্প। তাঁর গল্প পাঠ করলেই এক আঞ্চলিক জীবনের শিল্পীকে চিনে নেওয়া যায়। রসপ্রিয়া, তিসরী কসম, এক আদিম রাত্রি কী মহক প্রভৃতি গল্পে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মূলত প্রেমচন্দের উত্তরাধিকার বহন করলেও কাহিনি রচনায় তিনি নতুন পথের পথিক। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পেই নতুন নতুন চরিত্র ও পরিবেশ ফুটে উঠেছে। বিশেষত আঞ্চলিক জীবন-পরিবেশ থেকে মানুষেরা ভিড় করেছে তাঁর গল্পে। 'এক আদিম রাত্রি কী মহক' গল্পের নায়ক করমা এক বিচিত্র চরিত্র। মা নেই, বাবা নেই, এই সংসারে আপনজন বলতে কেউ নেই

তার। রেলের বাবুদের সঙ্গে থাকে, তাদের দেখা-শোনা ও পরিচর্যা করে, কিন্তু বিনিময়ে এক কানাকড়িও মাইনে নেয় না। তার করমা নাম যে কে দিয়েছে তাও সে সঠিক বলতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন বাবুর মুখে তার নাম বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়, নিতাই বাবু বলতেন কোরমা, ঘোষবাবু করিমা, সিং জি কামা আর অসগর বাবু বলতেন করম। তবে এ নিয়ে তার মনে কোনো খেদ নেই, সে অনায়াসে বলে উঠতে পারে নাম কি আসে যায় বাবু। এমনকি তার জন্মভূমি যে কোথায় তা-ও সে জানে না। তার নাম দেখে অনেকে অনুমান করে তার ঘর সাওঁতাল পরগনার রাঁচি-হাজারিবাগ অঞ্চলে। আর কেউ যদি জানতে চায় তার ঘর কোথায় তবে সে সন্ন্যাসীর মতোই উদাসীন হয়ে বলে উঠে, যেখানে ধড়, সেখানেই ঘর। মা-বাপ, ভগবান। কিন্তু বর্তমান যে বাবুটির কাছে সে আছে তাকে এমনতর উত্তর সে দিতে পারে না। এই নতুন বাবু মনে করিয়ে দেয় গোপালবাবুর কথা। এই গোপালবাবুই তো তার নামকরণ করেছিলেন করমা। গোপালবাবুর কাছেই সে জানতে পেরেছিল তার অতীত ইতিহাস। অসম থেকে আসা এক কুলি গাড়িতে সে পড়েছিল। সেখান থেকে উদ্ধার করেছিলেন তাকে গোপালবাবু। তারপর থেকে করমার মা-বাপ, ভাই-বোন, কুল-পরিবার সবকিছুই হয়ে পড়লেন গোপালবাবু। যেখানে যেতেন সেও সঙ্গে যেত, যা খেতেন করমাও তা-ই খেত। এভাবেই টানা পাঁচ বছর সে গোপালবাবুর সঙ্গে রইল। কিন্তু বাবু যখন রেল কোম্পানির পার্মানেণ্ট চাকরি নিয়ে বিয়ে করে বসলেন তখন থেকে করমার কপালও পুড়ল। গোপালবাবুর স্ত্রী মহিলা তো নন, যেন সাক্ষাৎ ডাইনি। রোজ রাতে ঝগড়া-মারপিট, বাবু পালিয়ে যেতে চাইলে চুলের মুঠি ধরে টেনে রাখত। বাবুর উপর হওয়া এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে করমা তাকে বাঁচাবার এক উপায় খুঁজে বের করেছিল, যখনই মার-পিট শুরু হতো তখন সে উঠে কড়া নেড়ে বলত, বাবু স্পেশালের কল ডাকছে। কিন্তু এভাবে কতদিন আর বাবুর প্রাণ বাঁচাতে পারত করমা? একদিন চোর অপবাদ দিয়ে করমাকে দূর করে দিতে বলল বাবুর সেই স্ত্রী। এরপর থেকেই কোনো স্টেশনের ফেমিলি কোয়ার্টার দেখলেই তার মনে পড়ে যায় সরু গলার সেই গালাগাল— চো-ও-ও-র! হারামজাদা। আর তখন থেকেই ফেমিলি কোয়ার্টারই শুধু নয়, মহিলা মুসাফিরখানা, মহিলা কামরা, মহিলা নাম শুনলেই তার বমি আসে। সে ঠিক করেছিল জীবনে আর কোনোদিন সংসারী বাবুদের কাজ করবে না। এবার থেকে কেবল রিলিফিয়া-বাবুদের সঙ্গেই থাকবে সে। কেন-না, ভবঘুরে সন্ন্যাসী, বহতা-নদী আর রিলিফিয়া-বাবু এদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। হেড-কোয়ার্টারে চব্বিশ ঘণ্টা হয় কি-না পরওয়ানা এসে পৌঁছায়, অমুক স্টেশনের মাস্টার অসুস্থ, সিক্-রিপোর্ট এসেছে। তাড়াতাড়ি জয়েন করো...রিলিফিয়া-বাবুদের বাক্স-বিছানা সবসময়ই তৈরি থাকা চাই। কম করে এক সপ্তাহ, খুব বেশি হলে তিনি মাস, এর চাইতে বেশি কোথাও স্থায়ী ভাবে থাকতে পারে না কোনো রিলিফিয়া-বাবু। কাঠের একটি বাক্সে সারা গৃহস্থী ভরে নিয়ে আজ এখানে, কাল সেখানে এভাবেই কাটে এদের জীবন। আর এই বাবুদের সঙ্গে সঙ্গে চলে করমা। কিন্তু গোপালবাবুর পর আর কারো কাছেই বেশিদিন টিকতে পারেনি করমা। গোপালবাবুই তাকে নিয়ে এসেছিলেন ঘোষবাবুর কাছে। তবে এক মাসের বেশি সেখানে

থাকা করমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, কারণ ঘোষবাবুর অশ্রাব্য গালাগাল, তারপর বাবু সিং জি-র পূজাগিরি ও শুচিবায়ুগ্রস্ততা করমার সঙ্গ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করল তাকে। অপর এক বাবু সাহু জি ছিলেন দরিয়াদিল মানুষ, কিন্তু এমন মদ্যপ যে দিন-দুপুরে মদ খেয়ে মালগাড়িকে পাস দিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা সংঘটিত করেন। তবে এই সাতদিন ধরে যে বাবুর সঙ্গে সে আছে তাকে দেখে বারবার গোপালবাবুর কথাই মনে পড়ে করমার। মনে মনে সে ভাবে এই বাবু তো খুব গুণী মানুষ। কিন্তু আমদপুরা নামের এই ছোটো স্টেশনে থাকতে ইচ্ছে করে না তার। হঠাৎ করে তার মনে পড়ে যায় মনিহারীঘাট স্টেশনের কথা। এই স্টেশনে দুবার থাকার সুযোগ হয়েছিল তার— প্রথমবার তিন মাস, দ্বিতীয়বার এক মাস। মনিহারীঘাট স্টেশনের ব্যাপারই আলাদা, তার তুলনায় আমদপুরার এই স্টেশন নেহাতই শিশু। তবে স্টেশন যেমনই হোক, নতুন স্টেশনে পৌঁছেই আশপাশের গ্রামগুলোতে এক-আধটা চক্কর কাটতে না পারলে করমার না জানি কেমন কেমন করে। মনে হয় কোনো অন্ধকূপে পড়ে আছে সে। আর সত্যিই তো যদি সে গ্রাম-ঘর, ক্ষেত-ময়দানে ঘুরে না বেড়াত, তাহলে গাছে চড়া, সাঁতার কাটা শিখত কি করে? যদিও করমার কোনো কিছুর প্রতিই মায়া-মোহ নেই, কোথাও শিকড় গেড়ে বসাও তার ধাতে নেই, তবুও পেছনে ফেলে আসা স্টেশনগুলোর কথা মাঝে মাঝেই তার মনকে আলোড়িত করে। মনে পড়ে লাখপতিয়া স্টেশনের কথা, নামটি জমকালো হলেও একটি ছাতু ব্যাপারির দোকানও নেই সেখানে। আশেপাশে পাঁচ ক্রোশ দূর পর্যন্ত কোনো গ্রাম নেই। তবে কেমন করে ভোলা যায় স্টেশনের পূর্বদিকের দুটো পুকুরকে। স্বচ্ছ আয়নার মতো ঝলমলে জল। বৈশাখের দুপুরে গলা জলে স্নান করার সুখ, মুখে বলার নয়। আর কদমপুরা স্টেশন, সত্য সত্যই কদমপুরা-স্টেশন থেকে গ্রাম পর্যন্ত হাজার হাজার কদমের গাছ। আবার কখনো বারিসগঞ্জ, কখনো বথনাহা স্টেশনের স্মৃতি জেগে ওঠে করমার মনে। কত লোক কত জায়গার স্মৃতি...সোনবরসার আম...কালচুকের মাছ...ভটোতরের দই, কিন্তু সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে মনিহারীঘাট স্টেশনের কথা। এই স্টেশনের সৌন্দর্যই অন্যরকমের। একদিকে জমি, অপরদিকে জল। একদিকে রেলগাড়ি, অপরদিকে জাহাজ। এপারে খেত-গ্রাম-ময়দান, ওপারে সাহেবগঞ্জ-কজরোটিয়ার নীল পাহাড়। নীল জল, সাদা বালি। তিন আর এক চার, পুরো চারমাস প্রতিদিনই গঙ্গায় ডুব দিয়ে স্নান করেছে করমা। অন্তত চার জন্ম কোনো পাপ ছুঁতে পারবে না তাকে। আর এতো সুন্দর নামও কোনো স্টেশনের হয়তো নেই— মনিহার। এই স্টেশনেই মস্তানা বাবার সঙ্গে পরিচয় হয় করমার। এই বাবা কুলি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং মনিহারীঘাটে কুলির কাজই করতেন কিন্তু একবার মন এমন উদাস হয়ে উঠল যে দাড়ি ও জটাজুট রেখে বাবা হয়ে গেলেন। মস্তানা বাবার সৎসঙ্গে থেকেই করমা দু-একটা জ্ঞানের কথা শিখেছে। বাবা বলতেন ঘাট-ঘাটের জল খেয়ে দেখেছেন সব জল ফিকে, এক গঙ্গাজলই মিষ্টি। এই মস্তানা বাবাই বলেছিলেন, "হর জগহ কী আপনী খুশবু-বদবু হোতী হ্যায়" (সব জায়গারই নিজস্ব সুগন্ধ-দুর্গন্ধ থাকে)। সত্যিই তো এই আমদপুরার গন্ধ করমার খাওয়া-দাওয়ার রুচি নষ্ট করে দিয়েছে। এখানকার নতুন পাকা ঘরে তার ঘুম আসে না, চুন আর বার্নিসের গন্ধে সর্বক্ষণ মাথা চিনচিন করতে

থাকে। তবুও বাবুর সঙ্গে স্টেশনে থাকতেই হয় তাকে। আর তাই নতুন এই জায়গাটিকে ভালো করে দেখার বাসনায় সে একদিন বাবুর কাছে ছুটি চেয়ে নেয়। তারপর রেলওয়ের হাতা পার হয়ে ধানক্ষেতে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া পাকদণ্ডী ধরে করমা এগিয়ে চলে। যেতে যেতে ক্ষেতে জমে থাকা জলে মাগুর মাছ দেখে করমার চলা নিজে থেকেই থেমে যায়। পাকা শিকারী করমা আটটি মাগুর ও একটা গড়ই মাছ ধরে গামছায় বেঁধে নেয়, আর হাঁটতে হাঁটতে এক গ্রামে এসে পৌঁছায়। গ্রামের প্রথম গন্ধ এসে তার নাকে লাগে, গাঁয়ের প্রথম লোকটিকে দেখতে পায় সে। এই বৃদ্ধটির সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছে করমার। এই বৃদ্ধের ঘরেই সে দেখা পায় সরসতিয়ার, লাল শাড়ি পরা সরসতিয়া, ছিলিমে ফুঁ দেওয়ার সময় যার গাল মোসাম্বির মতো গোল হয়ে যায়। কথায় কথায় সেই বৃদ্ধ, তার স্ত্রী, কন্যা সরসতিয়ার সঙ্গে এক আত্মীয়তার বন্ধন যেন গড়ে উঠতে থাকে করমার। বৃদ্ধ করমার মতো আজব মানুষ দেখে অবাক হয়— এ কেমন মানুষ, যে বিনে মাইনেয় কাজ করে। আর বৃদ্ধার স্ত্রী তাকে প্রথম দর্শনেই পুত্রস্নেহে কাছে টেনে নেয়, সযত্নে ভেজে খাওয়ার করমার ধরে আনা মাছ। সেই বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় করমার মনে হয়, তিন জোড়া চোখ যেন তার পিঠে লেগে আছে।

দেখতে দেখতে পনেরো দিন কেটে গেল, স্টেশন ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার সময় হয়ে গেল। ভোরের গাড়িতে করমা তার বাবুর সঙ্গে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবে। চলে যাবার আগের রাত, করমার কিছুতেই ঘুম আসবে না। চুন-বার্নিসের গন্ধ এখন তার সয়ে গেছে, তবে কেন ঘুম আসছে না? তার বাবু তো আরামে ঘুমিয়ে আছেন, গোপালবাবুর মতোই কোনো জায়গার প্রতি তাঁর তিলমাত্র মোহ নেই, নেই কোনো মায়া। কিন্তু করমা কি করবে, অদ্ভুত এক অনুভূতি জেগে উঠছে তার মনে। আগে তো কখনো এমন হয়নি। ...আরেক দিন এসো। নিজের ঘর বলেই ভেবো.....আমাদের কুটুম— ঘুরে ফিরে এই কথাগুলোই মনে পড়ছে করমার।

হঠাৎ করমা এক অদ্ভুত গন্ধ পায়, গন্ধের খোঁজে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে রেললাইনের দিকে। লাইনে পা পড়তেই সবগুলো সিগন্যাল বেজে উঠে, ফেমিলি কোয়ার্টার থেকে মহিলার চিৎকার ভেসে আসে চো-ও-ও-র। করমা দৌড়য়, একটা ইঞ্জিন তার পেছন পেছন ছুটে আসে, সরসতিয়া খিলখিল করে হেসে উঠে। তার ঝাঁকড়া চুল, তার না ধোয়া গায়ের গন্ধ, করমার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করল....সে ভয় পেয়ে সরসতিয়ার কোলে...না তার বুড়ি মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলল...রেল আর জাহাজের ভেঁপু একই সঙ্গে বেজে উঠে, সিগন্যালের লাল আলো...বাবুর ডাকে জেগে উঠলেও এক গন্ধের সমুদ্রে ডুবে থাকে সে। জেগে উঠে কুর্তা পরে নেয়, বাবুর বাক্স বাইরে নিয়ে আসে, কিন্তু সমস্ত কাজের মাঝেও সেই গন্ধে ডুবে থাকে তার মন।

গাড়ি আসে, বাবু গাড়িতে উঠে বসেন, বাবুর বাক্স করমা গাড়িতে তুলে দেয়, ট্রেন ছাড়ার সিটি বেজে উঠে। শেষবারের মতো করমা প্ল্যাটফর্মের দিকে ফিরে থাকায়, দেখতে পায় তার পনেরো দিনের সঙ্গী কুকুরটিকে। করমা সেইমুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়, এ জায়গা ছেড়ে সে কোথাও যাবে না এবং চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। মাটিতে পা

রাখতে গিয়ে ঠোকর খেয়েও সামলে নেয় সে।

এভাবেই আদিম রাত্রির সুবাস গল্পের নায়ক করমা অর্ধেক জীবন সভ্য মানুষের সঙ্গে ও স্টেশনে স্টেশনে কাটিয়ে দেওয়ার পরও শেষপর্যন্ত এক গ্রাম্য-বালিকার স্বেদ-গন্ধের আকর্ষণে গ্রামেই থেকে যায়। হঠাৎ সরস্বতীর দেহ থেকে ভেসে আসা ঘামের গন্ধ করমার মনে, হৃদয়ে প্রবেশ করে, আর করমা যেন নিজেকে, নিজের ঘরকে খুঁজে পেয়ে যায় আর সভ্য-সমাজের সহবাস ছেড়ে গ্রামেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সারা গল্প জুড়ে ইঞ্জিনের ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ আর স্টেশনের কয়লার ধুঁয়া, সিগন্যাল ইত্যাদির বিরক্তিকর উপস্থিতির বিপরীতে ক্ষেত-খামার, গাছ-পালা, নদী-পুকুর, ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া পাকদণ্ডী, পাকা ধানের সুঘ্রাণ এক মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। আর এই গল্পের নায়ক আদিবাসী বালক করমা, রেল, ইঞ্জিন, স্টেশন মাস্টার, বাবু— এই জগতের বাসিন্দা হয়েও মাছ-ধরাতেই আত্মসন্তুষ্টি লাভ করে এবং প্রকৃতির নিসর্গজাত সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে শুদ্ধমানবে পরিণত হয় ও আদিম সংস্কারের সামনে সভ্যতার নিরর্থক প্রলোভন তথা বন্ধন ঢিলে হয়ে যায়। এই গল্পটিতে রেণু আধুনিক সভ্যতার প্রলোভনের চাইতেও মানুষের আদিম সংস্কার ও প্রবৃত্তি যে বহুগুণে শক্তিশালী তা-ই সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। মানুষের অন্তরস্থিত সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলো আদিম হলেও এর এক সুবাস আছে যার অমোঘ আকর্ষণে বাঁধা না পড়ে কারো নিস্তার নেই। তাই করমাও এই সুবাসের টানে থেকে যায় ছোটো একটি গ্রামে।

৫.২.৩ ইতিহাস, ধর্ম আর মানুষ (ইতিহাস, মজহব ঔর আদমী)

এই গল্পটিতে এক জমিদার সন্তানের জাগ্রত বিবেক কীভাবে যুগ যুগ ধরে শোষিত, বঞ্চিত দরিদ্র জনগণের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হয়েছে এবং তাদের দুঃখ-কষ্টের শরিক হয়ে বিলাসী জীবনকে পরিত্যাগ করে মানবতার জয়গান ঘোষিত করেছে, তা-ই বর্ণিত হয়েছে।

দেওয়ালির রাত— লক্ষ্মীদেবীর শুভাগমনের একমাত্র দিন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনমোহন মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ক্যাম্পে চলে গেছে। আশ-পাশের গ্রামগুলোতে কলেরা আর মেলেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে— ক্ষুধা এবং রোগের সংযুক্ত মোর্চা। প্রত্যেক গ্রামেই রোজ আট-দশ জন লোক মারা যাচ্ছে। প্রচুর লেখালেখি, খুশামুদ ও লড়াই-ঝগড়া করে মনমোহন একটি মেডিকেল ক্যাম্প আনতে সক্ষম হয়েছে। সে স্বয়ং ডাক্তারের সঙ্গে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঔষধ এবং পথ্য বিলি করছে।

সেদিনও কাজ সেরে দুপুরে ঘরে ফিরে সে দেখতে পেল, কাজের লোকেদের সঙ্গে নিয়ে তার মা সাফাই-র কাজে লেগে পড়েছেন। কলা গাছের চারা লাগানো চলছে, আকাশপ্রদীপ বানানো হচ্ছে, রঙ্গীন কাগজের ঝলর সাজানো হচ্ছিল। আর এই সাজ-সজ্জা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল, গ্রামের নগ্ন-রুগ্ণ-অভুক্ত বালক-বালিকার দল। বৃদ্ধ পরিচারক রামটহল বারবার অকারণেই তাদের বকাবকি করছে, আর প্রত্যেকবার বকা

খাওয়ার পর তারা এক কদম পিছিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মনমোহন বারান্দায় পড়ে থাকা চেয়ারে ধুপ করে বসে পড়ল।

ঘরের হাওয়ায় চুন আর বার্নিসের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে, পাশের ঘরে মা চাকর দিয়ে কাজ করাতে করাতে বকবক করছিলেন...মনমোহন খ্রিস্টান হয়ে যাক, ঘরে মুর্গি রান্না করুক, মুসলমানের সঙ্গে বসে খাক, তিনি কিছু বলবেন না। এমনকি সে যে দেবী-দেবতাদের উপহাস করে, তাতেও তিনি বাধা দেন না। কিন্তু যখন মনমোহন তাঁর ধর্মাচরণে বিঘ্ন ঘটায়, মা লক্ষ্মীর পূজা করতে বাধা দেয়, তখন তিনি তা কেমন করে সহ্য করেন? বাপের কর্তব্য ছিল, ছেলেকে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন, ধন-সম্পত্তি, জায়গা-জমি রেখে স্বর্গগামী হয়েছেন। এখন পড়াশুনা করে ছেলে পণ্ডিত হয়েছে, রুজি-রোজগার না করলেও ক্ষতি নেই। তবে বাপের ইজ্জত, ঘরের মর্যাদাকে তো অক্ষত রাখার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু সে তো নয়ই, যতসব বখাটে-নিষ্কর্মাদের সঙ্গে মেলামেশা, ধর্ম ছেড়ে অধর্মের আলোচনা আর কিষাণ-মজদুর রাজ্য...।

মনমোহন বারান্দায় বসে সমস্ত কথাই শুনছিল, আর বুঝতে পারছিল মায়ের ক্রোধ এখনও শান্ত হয়নি। একটু বিছানায় গড়িয়ে নেওয়ার ইচ্ছে হওয়ায় সে চেয়ার ছেড়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকেই সে দেখতে পেল, তার পালঙ্কে এক অপরিচিত বৃদ্ধ আধিপত্য বিস্তার করে বসে আছে। তাকে দেখেই বৃদ্ধ বলতে শুরু করলেন, পরোপকার পরমধর্ম বটে, কিন্তু তা বলে দেব-দেবীর অনাদর, মা লক্ষ্মীর অপমান ইত্যাদি ধর্ম বিরুদ্ধ আচরণ উচিত নয়। মনমোহন তখন তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল ইনিই তাদের কুলপুরোহিত পণ্ডিত দিনমণি পাঠক। নাম শুনেই মাত্র দু-ঘণ্টা আগের কথা মনে পড়ে গেল তার। মহা-কাঙাল চেথরু মণ্ডল কাঁদতে কাঁদতে বলছিল যে পণ্ডিত দিনমণি তাকে লুটে নিয়েছে। তার একমাত্র জোয়ান ছেলের শ্রাদ্ধে পাঁচ টাকা দক্ষিণা তো নিয়েছেই উপরন্তু জবরদস্তি একটি গরুও খুলে নিয়ে গেছে। স্ত্রীর শ্রাদ্ধে টিপ সই নিয়ে তৃপ্ত হয়নি, ঘরের চাল থেকে কুমড়ো, শাক-সব্জীও তুলে নিয়ে গেছে।

মনমোহন কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে সহসা প্রশ্ন করে বসল, তার মা যে নতুন জমিটা কিনেছেন, সেটা কেনার পেছনে পণ্ডিতজির অবদান কতখানি। উত্তরে পণ্ডিতজি বলে উঠলেন যে, তিনিই তো সবকিছু করে দিয়েছেন। জমির বিধবা মালিকটি কিছুতেই মাটি বিক্রি করতে রাজি ছিল না, কিন্তু পণ্ডিতজি এমন ধর্মের প্যাচ কষলেন যে তার একগুঁয়েমি টিকল না। এবার মনমোহন জানতে চাইল কৈলাসপতির বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষীও কি তিনিই দিয়েছিলেন? তার উত্তরে মনমোহন সেই ভয়ঙ্কর সত্য জানতে পারল যে, তার বাবা জীবিত থাকলে পণ্ডিত এমন আরো অনেক মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে সারা লক্ষ্মীপুরের জমিদারি তাদের নামে করে ফেলতে পারত, আর কৈলাসপতির বিরুদ্ধে সাক্ষী সে মনমোহনের মায়ের আজ্ঞাতেই দিয়েছে। বৃদ্ধ পণ্ডিত আরো অনেক কথাই বলতে চাইছিল কিন্তু সে সুযোগ না দিয়ে তাকে দূর হয়ে যেতে বলল। কুলপুরোহিতের প্রতি করা এই অপমানজনক ব্যবহারে মনমোহনের মা ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হয়ে তাকে তিরষ্কার করে চললেন

আর মনমোহন পাথরের মূর্তির মতো বসেই রইল। মা চলে যাবার পর টেবিলে রাখা অনেকগুলি হিন্দী-ইংরাজি মাসিকপত্র এবং রঙিন পাথরের নিচে চাপা পড়ে থাকা একটি নোংরা, পুরোনো বইয়ের দিকে মনমোহনের দৃষ্টি পড়ল। হাতে তুলে নিয়ে সে দেখল বইটির নাম 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'। বইটির শেষের পৃষ্ঠায় রয়েছে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ছবি, আর তার নিচে লেখা রয়েছে, 'God save the king'। মনমোহনের মনে পড়ে যায়, স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সুরেলা কণ্ঠে 'God save the king'' গানটি গেয়ে পুরস্কার লাভ করেছিল সে। তবে পরবর্তীকালে মনমোহনের মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল কেন-না, যে বছর সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল, সে বছরই ভারত সরকার তাকে শান্তির শত্রু অভিহিত করে নজরবন্দী করেছিল।

মনমোহন বইটির পাতা উল্টিয়ে চলল, পানীপথের যুদ্ধ ...তাজমহলের ছবি...ঔরঙ্গজেব, ছত্রপতি শিবাজী...বাহাদুর শাহ...ইংরেজ শাসনকাল... রবার্ট ক্লাইভের পাশে most important লেখা দেখে সে থমকে গেল। ছেলেবেলায় ক্লাইভ ভীষণ দুষ্টু ছিল, স্কুলের জানালা, বেঞ্চ-গুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিত। মনমোহনের মনে পড়ে যায়, তাদের স্কুলের সুরজপ্রসাদকেও মাস্টারমশাই রবার্ট ক্লাইভ বলে ডাকতেন। খুব দুষ্টু ছিল, পুরো স্কুলে সবচাইতে বদমাশ....সারাজীবন সে একই রকম রয়ে গেল। ১৯৪২-এর আন্দোলনে তার ফাঁসি হয়েছিল। সুরজের কথা মনে করে আজও মনমোহনের দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। সুরজ আর নেই, অনেক বড়ো সংগঠনকর্তা ছিল, নির্ভীক, ঝড়-তুফানেও হাসতে পারা। শোনা যায় ফাঁসির দিন সে কেঁদেছিল, সত্যিই কেঁদেছিল কি? মনমোহনের বিশ্বাস নিশ্চয়ই তার ছোটো বোন সারদাকে একটিবার দেখার জন্য কেঁদেছিল সে, মৃত্যুভয়ে নয়। মা-বাপ হারা ছোট্ট সারদা খেতে না পেয়ে মারা গিয়েছিল। এসব কথা মনে পড়লে মনমোহনের মন হাহাকার করে উঠে। দুর্ভাগা এই দেশে এমন কত সুরজ অস্ত গেছে, কত সারদা ক্ষুধায় কাতর হয়ে ছটপট করতে করতে মারা পড়েছে।

পাতা পালটে সে দেখতে পেল সিরাজদৌল্লা... মাত্র বিশ বছর বয়সে নবাব হয়েছিলেন। মনে পড়ে গেল, সিরাজদৌল্লার বীরত্বের কাহিনি এতো প্রভাবিত করেছিল যে, একবার সিরাজকে নিয়ে একখানি কবিতাই লিখে ফেলেছিল মনমোহন। সহপাঠী-বন্ধু জ্যোৎস্নার সে কবিতা খুব ভালো লেগেছিল, বারবার শুনতে চাইত। সেই সময়টাই ছিল অন্যরকম, প্রত্যেকের মনেই দেশভক্তি ও দেশোদ্ধারের বাসনা জাগ্রত ছিল। তাই জ্যোৎস্নাও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিল। কিন্তু বর্তমানে পালটে যাওয়া পরিস্থিতিতে আরো অনেকের মতোই জ্যোৎস্নাও আদর্শচ্যুত হয়েছে, এখন সে রেডিয়ো-তে গণসংগীত গায়। ৪২-এর আন্দোলনে ট্রামে যারা আগুন লাগিয়েছে তারা গুণ্ডা, বদমাশ, এই ক্রান্তি ক্রান্তি নয়, শত্রু দাঁড়িয়ে আছে দ্বারে। এভাবেই জ্যোৎস্নার প্রসঙ্গ টেনে রেণু সে সময়ের রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শহীনতা ও সুবিধাবাদী মনোবৃত্তিকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি।

তার পরের পৃষ্ঠায় লেখা— এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডকে ব্ল্যাকহোল বলা হয়।

পঙ্‌তিটির উপর চোখ পড়তেই মনমোহনের মুখে হালকা হাসি ছড়িয়ে পড়ল। কেন-না ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে তার জানা আছে ব্ল্যাকহোল-কাণ্ডের প্রকৃত সত্যটি। রেণুর মতো কুশলী সাহিত্যিকের পক্ষে ইতিহাসের বিকৃতিকে সত্যের আলোকে তুলে ধরার জন্য মনমোহনের হাসিটুকুই যথেষ্ট, তার অতিরিক্ত একটি শব্দও ব্যয় করার প্রয়োজন হয় না। লেখক হিসাবে এখানেই তাঁর শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মনমোহন আবার বইয়ের পাতায় মনোনিবেশ করে...লর্ড কর্ণওয়ালিস...জমিদারি প্রথার জন্ম...সেই জমিদারি প্রথা আজ বিলুপ্তির পথে। মনমোহন ভাবে এই সর্বনাশা প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জমিদারেরা কত কী না করেছে। আজও নানা রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা রাষ্ট্র সেবক দল নামের একটি সংস্থাও স্থাপন করেছে। কিন্তু মুসলিম ন্যাশনেল গার্ড ও রাষ্ট্র সেবক দল কতদিন আর মুসলিম এবং হিন্দু পুঁজিপতিদের ডুবন্ত নৌকাকে বাঁচাতে পারবে। আজ যখন গ্রামে মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন কালো টুপি পরা সেবক দলের সদস্যরা উধাও হয়ে গেছে। কোনো সৎকর্মে এদের আগ্রহ নেই, যা কিছু আগ্রহ কেবল ধর্মের নামে লড়াই বাধানোয়। এমনই সাত-পাঁচ কথা ভাবতে ভাবতে কখন দীপাবলির সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, অন্ধকার ঘরে বসে মনমোহন নিজেকেই প্রশ্ন করছিল, "আছে সাহস? এই বিগড়ে যাওয়া ইতিহাসের পাতাগুলোকে ছিঁড়ে জ্বালিয়ে দিতে হবে।"

মা লক্ষ্মীর জয়ধ্বনির সঙ্গে তার বাড়ির পূজা সম্পন্ন হওয়ার পর প্রসাদ বিতরণের কোলাহল শোনা গেল। জমিদার বাড়ির পূজা দেখার জন্য, প্রসাদ পাবার জন্য গ্রামের ক্ষুধার্ত, রুগ্‌ণ-নগ্ন জনতার ভিড় উপচে পড়ল। কিন্তু সামান্য প্রসাদে কি ক্ষুধা মেটানো যায়? ঘরের প্রাঙ্গণ থেকে মা লক্ষ্মীর জয়ধ্বনি যতই ভেসে আসছিল, মনমোহনের ততই মনে হচ্ছিল এ জয়ধ্বনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির, লুট-বেইমানি-শোষণের, পাকিস্থানের, যুদ্ধের, ফ্যাসিজমের। অস্থির মনমোহন ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল এবং দেখতে পেল, গ্রামের কয়েকটি নিরোগ যুবক সামনের ময়দানে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে দৌড়ে দৌড়ে 'মশাল লীলা' পালন করছিল। দীপাবলির এই অন্তিম বিধি তার বড় ভালো লাগল, ঘোর অন্ধকারে জ্বলতে থাকা মশালের লাল...লাল অগ্নিশিখা। সে পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে পিছন ফিরে একবার তার বাড়ির দিকে তাকাল, দেখল সারি সারি সাজানো হাজার হাজার দীপ জ্বলজ্বল করছে। এই দৃশ্যকে তার মনে হল, শৃঙ্গার রসের কবিতার মতো, সুরামত্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন মেহফিলে নৃত্যরতা বেশ্যার মতো। আবার জ্বলন্ত মশালের দিকে তাকিয়ে মনে হল, এ যেন এক তাণ্ডব নৃত্য, এক মুক্ত গৃহ.... তার শিরা-উপশিরার রক্ত গরম হয়ে গেল। দৃঢ় পদক্ষেপ সে এগিয়ে গেল রোগগ্রস্ত গ্রামের দিকে, তার বাড়ি থেকে মাত্র একমাইল দূরে ছিল সেই গ্রাম যেখানে কয়েক মাস থেকে শেয়াল-শকুন-কুকুরের মহাভোজ-পর্ব চলছিল। গ্রামের মাঝখানে আমবাগানে মেডিকেল ক্যাম্প বসানো হয়েছিল, সেখানকার আলো দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। সে গ্রামে প্রবেশ করল, গ্রামের

এই প্রবেশপথ একেবারে শান্ত ছিল— শান্ত অর্থাৎ এই অঞ্চলের জনবসতি একেবারে নির্মূল হয়ে পড়েছে। সে গ্রামের পথে এগিয়ে চলল, একটি দুর্গন্ধময় নোংরা গলিতে এসে সে থমকে দাঁড়াল— সাদা ছায়ামূর্তিকে অন্ধকার ভেদ করে লুকিয়ে যেতে দেখা গেল। প্রথমে ভয় পেলেও নিজেকে সামলে নিল সে এবং ছায়ামূর্তিকেও চিনতে পারল, ডা° সিনহা আর মিস্ চ্যাটার্জী— মেডিকেল স্টুডেন্ট। চলতে চলতে তার মনে হল, অস্থিপঞ্জরময় গ্রামে ফুলঝুড়ি জ্বালিয়ে দীপাবলি পালন করা আর মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে প্রেমালিঙ্গন করার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। মূল্যবোধের অবনমনের ফলে সহৃদয়তা, করুণা, দয়া, সংদেনশীলতা ইত্যাদি মানুষের মন থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে মনমোহন হামিদ মিঞার ঘরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। হামিদ মিঞা— সারা গ্রামের হামিদ চাচা, তার দরজায় দাঁড়িয়ে সে রুকিয়াকে ডাক দিল। ঝুপড়ির ভিতর থেকে কাঁপা কাঁপা একটি আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। ভিতরে ঢুকে মনমোহন দেখতে পেল সুস্থ-সবল রুকিয়া, যে গ্রামবাসীর সেবা করে ক্যাম্পে আসা কলেজের মেয়েদেরও তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, সে-ই শতচ্ছিন্ন কাপড় গায়ে জড়িয়ে মাটিতে পড়ে কাঁপছে আর ঝুপড়ির অপর প্রান্তে পড়ে আছে হামিদের শক্ত হয়ে যাওয়া লাশ ও পাশে পড়ে আছে মুখ মেলে থাকা বুড়ির মৃতদেহ। মনমোহন চারদিকে তাকিয়ে দেখল ঝুপড়ির ভিতর আবর্জনা ছড়িয়ে আছে, কাপড় বলতে আছে দু-চারটে শতচ্ছিন্ন কাপড়ের টুকরো। চিন্তা করতে লাগল এবার কি করবে সে, তখনই শুনতে পেল রুকিয়া বলছে তাকে জড়িয়ে ধরার জন্য নাহলে তার কাঁপুনিতে তার দেহের হাড় খুলে আসবে। মনমোহন কোনো চিন্তা না করে রুকিয়ার পিঠের উপর নিজের দেহ চেপে ধরল, নোংরা কাপড়ের গন্ধে তার মাথা ঘুরছিল....একবার শরীর টেনে আনার চেষ্টা করতেই রুকিয়া কেঁকিয়ে কেঁদে উঠল। মনমোহন আবার তাকে চেপে ধরে সান্ত্বনা দিল, ভয় নেই ম্যালেরিয়া হয়েছে, ইঞ্জেকশন দিলেই ঠিক হয়ে যাবে সে। রুকিয়ার সেবা করছিল মনমোহন, তখনই উঠোনে একটি শেয়াল প্রবেশ করল। রুকিয়ার কাতরোক্তিতে ভয় পেয়ে শেয়ালটি ঝুপড়ির দিকে তাকালো, অন্ধকারে তার চোখ চকচক করে উঠল। বহু সময় ধরে সে তাকিয়েই রইল, আর মনমোহনের মনে হল শেয়ালটি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাদেরই দেখছে। কেন-না, রুকিয়া দুই হাতে তাকেই জড়িয়ে ধরে ছিল তখনও।

এই গল্পটিতে রেণু একদিকে যেমন জমিদারতন্ত্রের প্রতি থাকা তাঁর বিরাগ প্রদর্শন করেছেন, তেমনি অপরদিকে নিরন্ন রোগগ্রস্ত মানুষকে অবহেলা করে অসার ধর্মানুষ্ঠানে নিমগ্ন পুঁজিবাদের ধারক ও বাহক মনমোহনের মায়ের মতো মানুষগুলো এবং ইতিহাস রচনার নামে সত্যের অপলাপ করা ঐতিহাসিকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। তবে এ সব কিছু ছাপিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মানবতার জয়ধ্বজা বহনকারী মনমোহনের আদর্শবাদিতা, সহানুভূতিশীলতা ও সহৃদয়তা। নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত মনমোহন জমিদার সন্তান হয়েও জমিদার-তন্ত্রের জটিল আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে রুকিয়ার মতো হতদরিদ্র একটি মেয়েকে বাঁচানোর জন্য জাত্যাভিমানের অচলায়তনকে ভেঙ্গে দেবার সাহস দেখিয়েছে।

এছাড়াও এই গল্পটিতে লেখক অনন্যসাধারণ এক গঠনশৈলীর সাহায্যে ইতিহাস, ধর্ম এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্কটিকে জাজ্জ্বল্যমান করে তোলার প্রয়াস করেছেন। গল্পের শুরু হয়েছে মহামারীগ্রস্ত একটি গ্রামের জমিদার পত্নীর ধুমধাম করে দীপাবলি পালনের উদ্যোগের বর্ণনার মাধ্যমে। যদিও তার ছেলে মায়ের ধর্মের নামে এই আতিশয্য মেনে নিতে পারে না, কিন্তু তার কাছে দরিদ্র, নিরন্ন, রোগগ্রস্ত মানুষগুলোর চাইতেও অনেক বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে ধর্মানুষ্ঠান পালনের বিধি। কিন্তু পৃথিবীর কোনো ধর্মই যে আমাদের এই শিক্ষা দেয় না, দুঃস্থ-মানুষের পাশে দাঁড়ানোই যে ধর্মাচরণের প্রকৃত পন্থা এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে রেণু এই প্রসঙ্গটির উত্থাপন করেছেন। আবার রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণের মতোই রেণুও এই সত্যটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। আজ পর্যন্ত ইতিহাসের নামে কেবল রাজা-রাজড়ার যুদ্ধের কাহিনিই লিপিবদ্ধ হয়েছে, অথবা পরিবেশিত হয়েছে কিন্তু বিভ্রান্তিকর বিকৃত তথ্য। সিরাজদৌল্লার ব্ল্যাকহোল ঘটনাটিই তার সাক্ষ্য দেয়। আর পরীক্ষা পাশের জন্য এগুলিই মুখস্থ করতে বাধ্য হতে হয় আমাদের। তবে গল্পের শেষ অংশে রেণু এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, ধর্মপালনের উন্মাদনায় মানুষ যতই বিপথগামী হয়ে যাক না কেন, ঐতিহাসিকেরা শাসকদলের চাটুকারিতা করে যতই বিকৃত ইতিহাসের পাহাড় গড়ে তোলার চেষ্টা করুক না কেন, আজও পৃথিবীতে এমন মানুষের অভাব নেই যারা যথার্থ মানবতার পূজারী এবং ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদিকে ছাপিয়ে সে আপন চারিত্র্য গুণে উজ্জ্বল হয়ে উঠে অনাহার ক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ মানুষগুলোর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার মাধ্যমে। আর তাই রেণুর গল্পে ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদির বিপরীতে মানুষ স্বমহিমায় আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে হয়ে উঠে প্রকৃত মানুষ।

৫.২.৪ ভিত্তিচিত্রের ময়ূরী (ভিত্তিচিত্র কী ময়ূরী)

হিন্দী সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে প্রেমচন্দের পর গ্রামীণ জীবনের প্রমুখ কথাকার হিসেবে ফণীশ্বরনাথ রেণুর নামই বারবার উঠে এসেছে। তবে গ্রামীণ জীবনের রূপকার হয়েও তিনি আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ প্রেমচন্দের অনুকরণে মগ্ন না থেকে তাঁর গল্প অন্য মেজাজে ধরা দেয়। প্রেমচন্দ এবং রেণু দুজনের গল্পের চরিত্ররাই হল নিম্নবর্গীয় হরিজন, কৃষক, লোহার, চর্মকার, কর্মকার ইত্যাদি। কিন্তু প্রেমচন্দের অধিকাংশ গল্পে এই উপেক্ষিত, উৎপীড়িত মানুষগুলোর আর্থিক শোষণ অথবা তাদের সামন্তব্যবস্থা ও মহাজনী ব্যবস্থার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার নিদারুণ করুণ অবস্থাই চিত্রিত হয়েছে। অপরদিকে রেণু এই অত্যাচারিত, শোষিত মানুষগুলোর সাংস্কৃতিক সম্পন্নতা, মনের কোমলতা এবং রাগাত্মিকা তথা শিল্পীসুলভ প্রতিভার হৃদয়স্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন। আলোচ্য ভিত্তিচিত্রের ময়ূরী গল্পটিতেও আধুনিক জীবনের অভিঘাতে হারিয়ে যেতে বসা লোকশিল্পের ঐতিহ্যকে বাঁচানোর প্রচেষ্টাকেই মূল বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

ফুলপতিয়ার মা হাতির শুঁড়ে কালো রঙ করে ময়ূরের পাখা আঁকায় তন্ময় ছিল,

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল। মুখ তুলে ফুলপতিয়ার মা দেখল হাকিমের মতো দেখতে এক যুবক ছোটো পান-বাটার মতো কালো বাক্সে চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘাবড়ে গিয়ে সে অসম্বৃত কাপড় সামলানোর সময় আবার বিজলী চমকে উঠল। এবার ফুলপতিয়ার মা ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু সেই যুবক তাড়াতাড়ি এসে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল যে সে তার ছেলের মতোই। এতে ফুলপতিয়ার মা আরো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার মেয়েকে ডাক দিল। ততক্ষণে গ্রামের প্রায় দেড় ডজন কাচ্চা-বাচ্চা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। ফুলপত্তি তখন উঠোনে বসে পাটায় আতপ চাল বাটছিল, একটি আট-দহ বছরের ছেলে এসে সূচনা দিল ফুলপত্তি এখানে বসে চাল বাটছে আর ওদিকে মাসিকে ইন্সপেক্টর অ্যারেস্ট করে নিয়েছে। ইতিমেধ্যে মায়ের ডাক শুনতে পেয়ে হাত না ধুয়েই সে দরজার দিকে দৌড় দিল এবং দরজার কাছে পৌঁছে সে দেখতে পেল, ইন্সপেক্টর তার মায়ের পায়ে কাছে হাঁটু মুড়ে বসে আছে আর বলছে মাতাজীর হাতের কাজ শেষ হলে পর সে তার কাজের কথা বলবে। ফুলপত্তির উপর হঠাৎ যেন ভগবতী থানের কোনো দেবী ভর করলেন, তার মায়ের কাছে এক চিলতে জমি নেই— না নিজের, না ভাগচাষের। কিন্তু তার নামে জলের খাজনা চাপিয়ে নোটিস পাঠানো হয়েছে পনেরো দিনের ভিতরে খাজনা পরিশোধ না করলে জিনিসপত্র-গবাদি পশু ক্রুক হয়ে যাবে। ফুলপত্তি রাগে ফেটে পড়ল এবং যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, অ্যারেস্ট করতে হয়, জেলে যেতে হয় সে যাবে এই বুড়ো বয়সে তার মার হাতে সে হাতকড়া পরাতে দেবে না। ততক্ষণে গ্রামের পুরুষেরা কাজ ছেড়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। আঠারো বছরের ফুলপত্তি তার মাকে আগলে বসে তখনও চিৎকার করে চলছিল প্রাণ চলে গেলেও সে তার মাকে নিয়ে যেতে দেবে না। তখন সেই যুবকটি যাকে হাকিম ভেবে এতো কাণ্ড হচ্ছিল, সে হাত জোড় করে ফুলপত্তির সামনে গিয়ে বলল সে কোনো হাকিম নয় এবং কাউকে গ্রেপ্তার করতেও আসেনি, সে এসেছে কুটির শিল্প পাটনার তরফ থেকে। তার কথা শুনে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেও হাসিতেই কথাটা মিলিয়ে গেল না। বরং পুরো গ্রামে এ কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগল যে, ফুলপত্তির আঁকা ছবির ফটো তুলে পাটনা থেকে আসা জেণ্টলম্যান বাবু আমেরিকা রাশিয়া কোথায় যেন পাঠাবে। ফুলপত্তির মাকে আমেরিকা, রাশিয়া পাঠাবে, শোনা যাচ্ছে এই ছবির ডবল বকশিস পাওয়া যাবে। সত্য সত্যই জীবনভর শুভলাভ এবং পালা-পরবে গ্রামের লোকের ভিতে ফুলপাতার মাঝে দেবী-দেবতার ছবি আঁকারই সুফল এটা।

আঠারো-উনিশ বছর আগে ফুলপত্তির বাবা মোকদ্দমায় হেরে জায়গা-জমিন সব খুইয়ে শোকে মূহ্যমান হয়ে আত্মহত্যা করার পর ফুলপত্তির মা অনেক কষ্টে তার একমাত্র মেয়েকে পালন-পালন করেছে। হাতের গুণ ছিল, তাই তার একটু কদর ও প্রতিষ্ঠা ছিল গ্রামে। এখন তো সেটাও নেই। পরিবর্তিত যুগের আধুনিকতার হাওয়া গ্রামে এসেও পৌঁছেচে, আজকাল বিয়ে-শাদি, পালা-পরবে বাড়ির ভিতে মণ্ডণ শিল্প নয়, কাগজে ছাপা দেব-দেবীর ফটো ছাড়াও সিনেমার ছবিও টাঙানো হয়। কিন্তু ডাকপিওন এসে যখন ফুলপত্তির মা-র নামে আসা আড়াই-শো টাকার মানিঅর্ডার দিয়ে গেল, তখন

গ্রামবাসীরা স্বীকার করে নিল যে পুরোনো যুগের সবকিছুই ফেলনা নয়। হঠাৎ করে গ্রামবাসীর চোখে ফুলপত্তির মায়ের কদর বেড়ে গেল। তারপর একদিন শোনা গেল ফুলপত্তির মা দিল্লী গেছে, সেখানে একটি ভিতে আলপনা আঁকার মজুরি এক হাজার টাকা— মজুরি নয়, বকশিস। এ সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করেছে পাটনা কুটির শিল্পের তরফ থেকে আসা সেই যুবক সনাতন। কিছুদিন পর দেখা গেল সংবাদ পত্রে ফুলপত্তির মায়ের ছবি ছাপা হয়েছে, বড়ো-লাটসাহেবের হাত থেকে বকশিস নিচ্ছে সে। সংবাদ পত্রে আরো লিখেছে, শ্রীমতী পনিয়া দেবী ওরফে পান্না দেবী নিজের আঁকা ছবিতে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে দেবনাগরীতে নিজের নাম, গ্রাম ও জেলার নাম লিখতে কখনো ভোলে না। নিজের নামের সঙ্গে গ্রামকেও বিখ্যাত করছে বলে গ্রামবাসীরা গর্বিত বোধ করে। পান্না দেবীর ফিরে আসার দিন মহা ধুমধাম ও জয়ধ্বনির সঙ্গে গ্রামবাসীরা তাকে স্বাগত জানায়।

ফিরে আসার পর সনাতন প্রস্তাব দেয়, গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে বাস করার। আর সত্যিই তো কি আছে এই গ্রামে? পুরোনো জরাজীর্ণ একটি কুটিরের মোহে এখানে পড়ে থাকার কোনো যুক্তি নেই। নিরীহ, গোবেচারা ফুলপত্তির মা, তার মনে কোনো ছল-কপট নেই। তাকে যা বোঝানো হল, সে তাতেই রাজি হয়ে গেল। কিন্তু বাধ সাধল ফুলপত্তি, সে গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে একেবারেই রাজি হল না উপরন্তু এই প্রস্তবের কথা তার কানে যাওয়ামাত্রই সে স্নান-খাওয়া ছেড়ে ঘরে পড়ে রইল। সবাই বুঝিয়ে বুঝিয়ে হার মানল। এদিকে ফুলপত্তির এই জেদ দেখে সনাতন চিন্তায় পড়ে গেল, গত দু-রাত তার চোখে ঘুম আসেনি। চোখ বন্ধ করলেই তার মনে হয়, তার ভিতরে বসে কেউ একজন প্রশ্ন করছে— এ কি করছে সে? কুমারীকে অপবিত্র করতে চাইছে? আপন বাসনা পরিপূর্তির জন্য শিল্পের কারবার ফেঁদেছে? লোকশিল্পী তথা লোকশিল্পকে যথার্থ মর্যাদা দানের নাম করে তারই বিগস্কেল ফোক-আর্ট ইণ্ডাস্ট্রীর কারখানায় ফুলপত্তি ও তার মাকে জবাই করবে। তারপর মধুবনী শৈলীর প্রমুখ জ্ঞাতা, বক্তা ও অধিকারী হয়ে লোককল্যাণের এক মিথ্যে মায়াজাল ছড়িয়ে নিজের প্রাইভেট চেম্বারে বসে থাকবে, আর কেবল ফুলপত্তি ও তার মা-ই নয় কত অসংখ্য শিল্পী এভাবে শহুরে এই লোকগুলোর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে দিতে বাধ্য হবে।

আসলে সনাতনের মতো ব্যক্তিদের মনে লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার, অথবা লোকশিল্পীকে প্রকৃত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদ ততটা নেই, যতটা আছে এদের প্রতিভাকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে অর্থ-নাম-যশ-প্রতিপত্তি লাভের বাসনা। তাই ফুলপত্তি শহরে যেতে রাজি না হলেও সনাতন পুরোপুরি আশা ছাড়তে পারে না। সে নিজেই ফুলপত্তিকে বুঝিয়ে রাজি করাতে এগিয়ে আসে।

তখন ফুলপত্তি তার ঘরের দরজার ভিতে তার মায়ের আঁকা সম্পূর্ণ ময়ূরীর চিত্রটিতে রঙ ভরছিল, সনাতন তাকে আরেকবার ভেবে দেখার কথা বলতেই সে উত্তর দিল, তার মা যদি যেতে চায় তো সে তাকে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু ফুলপত্তিকে যেন এ বিষয়ে কিছু না বলে। সনাতন তখন ফুলপত্তিকে জিজ্ঞাসা করে কার জন্য, কোন আকর্ষণে সে

এই গ্রামে থাকতে চাইছে। ফুলপত্তি তখন ভিত্তির উপর চিত্রিত সুসজ্জিত প্রেখম মেলে নৃত্যরত ময়ূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল, ওই খানে যে নাচছে তারই আকর্ষণে...। সনাতন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তার দ্বিতীয় প্রস্তাব নিবেদন করল কিন্তু ফুলপত্তি অতি উৎসাহের সঙ্গে ময়ূরের পাখায় রঙ্গ ভরতে থাকল।

ফুলপত্তি জেদের কাছে সনাতনকে হার মানতে হল। গ্রামে আবার এক নতুন খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, ফুলপত্তির মা গ্রাম ছেড়ে যাবে না, স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবে না সে। তবে সনাতন এই গ্রামেই একটি সেণ্টার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পাটনা-দিল্লী এবং কোলকাতা থেকে বাছাই করা মেয়েরা তিনমাসের ট্রেনিং নিতে আসবে এখানে। ঘরে বসেই ফুলপত্তির মা পাঁচশো-হাজার টাকা পেয়ে যাবে, আর জেলা ও গ্রামের মেয়েদেরও বিনামূল্যে শেখানো হবে। এই খবর সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়েছে আর একই সঙ্গে গ্রামের সম্পূর্ণ নামও কাগজে ছাপা হয়েছে— 'মোহনপুরের 'মধুবনী আর্ট সেণ্টার'-এর ভবনের শিলান্যাসের জন্য দেশের প্রসিদ্ধ চিত্রকার হুসেনকে অনুরোধ করা হয়েছে।

এভাবেই নিতান্ত সাধারণ গ্রামের একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া মেয়ে ফুলপত্তির কলা-শিল্পের প্রতি অনুরাগ, আপন শিল্প-সংস্কৃতিকে বিপণন সামগ্রীতে পরিণত না করার সদিচ্ছা এবং খ্যাতি ও অর্থের পিছনে না ছুটে শুধুমাত্র নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ সুযোগসন্ধানী স্বার্থপর মানুষের চিত্তকেও আমূল পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছে।

আর ফণীশ্বরনাথ রেণু তাঁর অপর এক গল্প 'রসপ্রিয়া'-য় যেমন এক লোক গায়কের ব্যর্থতা, যন্ত্রণাকে মূর্ত করে তুলেছেন। বদলে যাওয়া নতুন পৃথিবীর নতুন সংস্কৃতি, নতুন শিল্পজগতে লোকশিল্পী পঞ্চকৌড়ি মিরদঙ্গিয়া হয়ে উঠেছে অনাবশ্যক। কালের অমোঘ নিয়মে যে সুপ্রাচীন লোকশিল্প-সংস্কৃতি আজ বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং পঞ্চকৌড়ির মতো শত শত লোকশিল্পীকে তা অসহায় ভাবে স্বীকার করে নিয়ে চিরকালের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে বাধ্য হতে হয়েছে। তেমনি "ভিত্তি চিত্রের ময়ূরী" গল্পটিতে লোকশিল্পের ঐতিহ্যশালী ধারাটিকে প্রবহমান রাখার প্রয়াস কীভাবে সফলতা লাভ করেছে এবং পরিবর্তিত যুগমানসের অবহেলা, অবজ্ঞাকে সহ্য করে, অর্থলোভ ও আরাম-আয়াসে জীবন কাটানোর প্রলোভনকে জয় করে শিল্পকলাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার অনবদ্য কাহিনিই রচনা করেছেন লেখক।

৫.৩ নির্বাচিত গল্পের চরিত্র বিচার

ফণীশ্বরনাথ রেণুর গল্পগুলোতে যে অজস্র চরিত্রের আগমন ঘটেছে, এত বিভিন্ন জীবন স্থিতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, তার মূল কারণ হল রেণু তাঁর গল্পে নিজেকেই খুঁজে ফিরেছেন। নিজেকে অর্থাৎ মানুষকে। আর নিজ সৃষ্ট চরিত্রে নিজেকেই খোঁজা, আপন পূর্ণতারই অনুসন্ধান করা এবং একই সঙ্গে সমাজের প্রতিটি স্তরে নিজেকে সমাহিত করাও। রেণু তাঁর গল্পে এমন সমস্ত মানুষের কথা বলেছেন, যারা তাদের নিজস্ব সহজ

রূপে, নিজের ভালো-মন্দ নিয়ে, আপন কর্মঠতা, সংঘর্ষশীলতা, ভাবুকতা, রসিকতা, সংবেদনশীলতা এবং কঠোরতা- কোমলতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। রেণু তাঁর প্রত্যেকটি চরিত্রকে পূর্ণ সহানুভূতি দান করেছেন, তাদের মনস্তত্বকে অনুধাবন করেছেন। তবে কেবল মানুষই নয়, পশু-পক্ষী, নদী-নালা, বৃক্ষ-বনস্পতি সবকিছুর প্রতিই ছিল তাঁর পরম মমত্ববোধ। আর তাই রসপ্রিয়া গল্পের পঞ্চকৌড়ি মিরদঙ্গিয়া—যে নাচ-গান শিখিয়ে জীবিকা অর্জন করে, বৃদ্ধাবস্থায় যার কণ্ঠস্বর ফুটো হাপরের মতো হয়ে পড়েছে; তিসরি কসমের কালো, বছর চল্লিশের গাড়োয়ান—প্রেমে পরিপ্লাবিত, সহজ-সরল হিরামন; মেলায় নাচনেওয়ালি কিন্তু কোমল-নিষ্পাপ, হিরাবাঈ— এই মানব চরিত্রগুলির পাশাপাশি কিশন মহারাজের মতো চরিতত্রেরও দেখা পাওয়া যায়, যে মানবেতর জীব হয়েও গ্রামের সংকীর্ণ বর্ণবাদ ও পরস্পর ঈর্ষা-দ্বেষকে থামানোর জন্য আত্মবলিদান করে, আবার কখনো একটি বটবৃক্ষকেই প্রধান চরিত্র হয়ে উঠতে দেখা যায় বটবাবা গল্পটিতে।

এমনই অজস্র চরিত্র, সমাজব্যবস্থার দ্বারা অত্যাচারিত, উপেক্ষিত, দলিত কিন্তু পরম মানবীয়, মাটির কাছাকাছি, সাংস্কৃতিক সম্পদে সম্পন্নশালী, প্রেম ও রাগে সিক্ত মানুষগুলোর জীবনের সঙ্গে একাকার হয়ে রেণু তাঁর গল্পগুলো রচনা করেছেন অথবা এ ও বলা যায়, এই চরিত্রগুলোর সাহায্যেই নির্মিত হয়েছে তাঁর গল্পজগৎ।

এবার আমরা রেণু সৃষ্ট এমনই কয়েকটি অসাধারণ চরিত্রের আলোচনায় অগ্রসর হব।

৫.৩.১ হিরামন (তিসরি কসম)

তিসরী কসমের নায়ক বছর চল্লিশের সহজ-সরল, বৌদির অনুশাসনের প্রতি নিবেদিত ও অনুগত যৌবন অতিক্রান্ত অথচ প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পে আবদ্ধ এক গাড়োয়ান হল হিরামন। সার্কাস কোম্পানির একটি বাঘ পৌঁছে দিল, তো দুর্লভ গৌরব, থিয়েটারের মেম-কে পৌঁছে দিল, তো গৌরব। আর আজ হিরাবাঈকে নিয়ে চলেছে তো পরম গৌরবের কথা। থিয়েটার কোম্পানির এই নর্তকীকে গাড়িতে নিয়ে যেতে যেতে শিশুর মতো সরল এই যুবক তার অবদমিত অবচেতনে চারদিকে চম্পা ফুলের সুগন্ধ, শিরা-উপশিরায় শিহরণ আর পাশাপাশি লজ্জাও অনুভব করে। কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচবশত কোনো কথা বলে উঠতে পারে না তার সঙ্গে। মন খুলে কথা বলা তার পক্ষে তখনই সম্ভব হয়, যখন হিরাবাঈ লোককথা অথবা গীত শুনতে চায়।

গাড়িতে হিরাবাঈর উপস্থিতি যুগপৎ। হিরামনের মনে ভীতি ও সৌন্দর্যানুভূতির জন্ম দেয়— "গাড়ী জব পুরব কী ঔর মুড়ী, এক টুকড়া চাঁদ উসকী গাড়ী মে সমা গয়া। সওয়ারী কী নাক পর এক জুগনু জগমগা উঠা....সামনে চম্পা নগর সে সিন্ধিয়া গাঁও তক ফ্যায়লা হুয়া ম্যায়দান... কহী ডাকিন-পিশাচিন তো নহী?" (গাড়ি যখন পূর্ব দিকে মোড় নিল, এক টুকরো চাঁদ তার গাড়িতে প্রবেশ করল। সওয়ারির নাকে একটি জোনাকি

ঝিলমিল করে উঠল... সামনে চম্পা নগর থেকে সিন্ধিয়া গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা ময়দান... কোনো ডাইনি-পিশাচিনী নয় তো?)

কিন্তু খানিক পরেই হিরামন অনুভব করে— আরে বাবা! এ তো পরী।

হিরাবাঈ-র সংসর্গ হিরাকে কবিসুলভ সংবেদনশীল কোমল শিহরণ তথা প্রেমসৌরভের মদিরতায় বিভোর করতে পারে, বিগত যুগের সমস্ত অবসাদ ও বিয়োগান্তক প্রেমগাথা-র সমগ্র মর্মিতা নিয়েও শেষপর্যন্ত সে কিন্তু এক গাড়োয়ানই। তাই থিয়েটার কোম্পানির অভিনয় চলাকালীন সে মার-পিট করতেও জানে, আবার চোরবাজারের মাল বোঝাই ও দৌড়-ঝাঁপ করতেও জানে। তবে এমন সব কাজ করতে গিয়ে যখন বিপদগ্রস্ত হয়, তখন নিজের অজ্ঞতা এবং সরলতা-তাড়িত হিরামন আপনা থেকেই মেনে নেয় তার শপথের বাধা-নিষেধকে। তার চল্লিশ বছরের জীবনকালে সর্বমোট তিনটি শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছে হিরামন তবে প্রথম দুটি শপথের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক পরিস্থিতিতে উচ্চারিত হয়েছে তার তৃতীয় শপথটি।

প্রথম শপথের বিষয়টি ছিল বিপজ্জনক। কণ্ট্রোলের যুগ, চারবার সিমেণ্ট ও কাপড় বোঝাই গাড়ি জোগবনী থেকে নেপালের বিরাটনগর পাচার করার পর পঞ্চমবার তার গাড়ি ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। উপায় না পেয়ে গাড়ি থেকে বলদদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল হিরামন। তরাই অঞ্চলের ঘন জঙ্গলে নদী-নালা পার করে রাত ভর ছুটে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল সে। ঘরে পৌঁছে দু-দিন বেহুঁশ পড়ে থাকার পর তৃতীয় দিন জ্ঞান ফিরতেই কান ধরে কসম খেয়েছিল, চোরবাজারি মাল আর কোনোদিন নয়। হিরামনের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার বিষয়টিও কম আকর্ষণীয় নয়। বাঁশ বোঝাই গাড়ি নিয়ে শহরের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় মেয়ে-স্কুলের সামনে এসে তার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এই দুর্ঘটনার কথা মনে পড়লেই হিরামনের শরীরে কাঁপুনি দেখা দেয়। অতএব সে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা করে বসে, জীবনে আর কোনোদিন গাড়িতে বাঁশ বোঝাই করবে না।

এবারের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত, অনুভূতিও অন্যরকমের। একবার সার্কাসের বাঘের খাঁচা-গাড়িকে বয়ে নিয়ে যাবার রোমহর্ষক কাজেও লাগিয়েছিল সে তার গরুর গাড়িকে; কিন্তু আজকের মতো অনুভূতি তো আগে কখনোও হয়নি। এবারের মেলায় ভাড়া খাটতে এসে সওয়ারি পেয়েছে সে এক নারীকে। গাড়ি হাঁকতে হাঁকতে বছর চল্লিশের বিপত্নীক হিরামন ভাবে, এ কোনো নারী, না চম্পা ফুল! তখন থেকে গাড়ি সুগন্ধে আমোদিত হচ্ছে। হিরামনের সওয়ারি আর কেউ নয়, মেলায় আসা নাটক-কোম্পানির নর্তকী হিরাবাঈ। পথ চলতে চলতে কথায় কথায় বন্ধুত্ব হয়ে যায় দুজনের।

হৃষ্টপুষ্ট, কুচকুচে কালো দেহাতী যুবক হিরামন, যার আপন গাড়ি আর বলদ ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো বিষয়েই বিশেষ আগ্রহ নেই, পথ চলতে চলতে সে-ই কিন্তু হিরাবাঈ-র সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়। হিরাবাঈ-এর মধ্যে সে খুঁজে পায় তার মনের মিতাকে। তারপর কখনো গল্প শুনিয়ে, কখনো লোকগীতি শুনিয়ে এক স্বপ্নময় যাত্রার অংশীদার হয় সে। এই মেলায় এসে তার মনের মিতাকে পেয়ে সব কিছু হারিয়ে বসেছে হিরামন।

কিন্তু যত বেশি এই মিতার সাহচর্য পাচ্ছে, ততই তো আরো বেশি নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে সে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। উল্টো বিশ্বাসে মনকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছে হিরামন— কোম্পানির মেয়েলোকটি তো কোম্পানিতেই গেছে। এখন তার সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্কই বা কিসের। কিন্তু এই অপর জনের সুখ তো অন্য কারো সুখ নয়, এ একান্তই হিরামনের নিজস্ব সুখ।

রাতের জ্যোৎস্নায়, দিনের রৌদ্রতাপে গ্রামের যাত্রা কাহিনির মতো চলতে থাকে গল্প। আর সেই চলতে থাকা লোকজীবনের মধ্য দিয়ে চলা উন্মুক্ত পথে চলার মতো। "এই যাত্রায় আছে রস। এই চলায় যেমন আছে কথা-র রস তেমনি আছে উপভোগের আনন্দ-রসও। এ গল্প কোনও রূপকথা নয়, বাস্তবিকই হিরামনের গাড়িতে আছে তার মিতা। তার পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়া গন্ধ তার পুরো অস্তিত্বটাকে জড়িয়ে ধরে এই ঘটনাটির সঙ্গে। ইসস কাঁঠালীচাঁপা..."!

এই যে ইন্দ্রিয়বোধ, এ তো তার বিশ্ববোধেরও অংশ। আর হিরামনের বিশ্ববোধ তো কোনও বই থেকে পাওয়া নয়— এই বিশ্ববোধ তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত নিরক্ষরদের মধ্যে একই রকম। অক্ষর যেমন ধ্বনিকে আশ্রয় করে থাকে, তেমনি থাকে গন্ধ এবং স্পর্শেরও ভিতরে। মনের ভাষা তো প্রকাশ পায় এ সব কিছুর সঙ্গে মিলেমিশে, একইসঙ্গে। হিরামন ও হিরাবাঈ-র ওই পুরো যাত্রাটিই তো হল এক গন্ধ-স্বর ও স্পর্শকে খুঁজে ফেরা। মিতার সঙ্গে হিরামনের ওই যাত্রা অদৃশ্য স্পর্শের আত্মীয়তাকে যেন পৌঁছে দেয় পাঠকের মনের গভীর হিরামনের নবজাগ্রত অনুভূতি তার মনে যে সুখের সঞ্চার করেছে, তার ভিতরে রয়েছে এক গভীর স্তব্ধতা। আর এই স্তব্ধতা আছে বলেই তার বুকের ভিতরে লুকিয়ে রাখা আবেগের আতিশয্যে যদি নিজে ব্যর্থও হয় হিরামন, তবুও তার ওই সুখ কিন্তু তার অখণ্ড নিটোল একটি সুখ হয়েই থাকবে। হিরামনের এই ভাবুক অনুভূতির মধ্যে নেই কোনও আত্মকরুণা।

আপন ভাবনার একান্তে হিরামন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় তার মিতাক। এই আত্মীয়তার ফলেই এক বেদনা বিধুর মানসিক অবসাদে ভরে যায় তার মন। তবে দীপ্তির উদ্ভাসে অনেক বেশি সহজ ও বরণীয় হয়ে যায় এই অবসাদ। আর অনুরাগের আলোয় ভরা এই যাত্রার সমাপন ঘটে এক মেলার জগতে, এক নাটকের জগতে। গ্রামীণ সমাজের গাড়োয়ান আবার ফিরে আসে তার নিজের জগতে। লালমোহর, পলটদাস, ধুন্নীরামের উপস্থিতি বদলে দেয় পারিপার্শ্বিক দৃশ্যপট। এখন স্বগত সংলাপের ভাষাও বদলে যায় আদালতের বুলিতে। কিন্তু মেলার দুনিয়ায় তার নিজের মিতার সঙ্গেও কি হিরামন মেলার ভাষাতেই কথা বলবে।

না, কোনও শস্তা চটকদারি ব্যবসায়িকতা থাকা সম্ভব নয় তার মিতার মধ্যে। হিরামন তা কল্পনাও করে না। কিন্তু তবুও সে তার মিতাকে ধরে রাখতে পারে না, তার আপন মিতাকে ছেড়ে দিতেই হয় ব্যবসাদারের হাতে। রেলগাড়ি হিরাবাঈকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম খালি করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিরামনের দুনিয়াটাকেও যেন খালি করে চলে গেল।

বাজার সর্বস্ব এই দুনিয়া কি এভাবেই প্রয়োজনমাফিক কিনে নেয় মানুষকে? শক্তসমর্থ পুরুষ, চাকর, শ্রমিক এবং নারী— সকলেই তো বাজারি মাল! তাই যেতে যেতে হিরাবাঈ-র মুখ থেকে নির্গত হয় এই সত্যটি, "কি মিতা?... মহুয়া ঘাটোয়ারিনকে সওদাগর কিনে নিল যে"। এই তো হল সময়ের প্রভুত্বের এক প্রভাববিস্তারী ছবি। আর এই সময়ের বুকে দাঁড়িয়েই হিরামন উচ্চারণ করে তার তৃতীয় শপথটি— "কোম্পানির মেয়েমানুষের সওয়ারি..."।

আর খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে আসার সময় গুনগুন করে গেয়ে ওঠা হিরামনের "অজী হাঁ, মারে গয়ে গুলফাম"— এই গানটিতে যে কী গভীর মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৫.৩.২ হিরাবাঈ (তিসরী কসম)

তিসরী কসম গল্পটির এক অসাধারণ উজ্জ্বল চরিত্র হল হিরাবাঈ। হিরামনের মিতা, পেশায় নাটক কোম্পানির নাচনেওয়ালি বাঈজী অথচ কি সরল-কোমল, নিষ্পাপ এই নারী। কোনো ছলা-কলা নেই, নেই কোনো ঔদ্ধত্য অথবা রূপের অহংকার— যা এজাতীয় নারীদের স্বভাবসিদ্ধ। আর তার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হিরামনের মনকে মোহিত করেছে। সংবেদনশীল মনের অধিকারী এই নারী বলদকে পাচনের আঘাত খেতে দেখলেও কষ্ট পায়। তার সৌন্দর্য হিরামনকে বিস্মিত করে, তার কণ্ঠস্বর শিহরিত করে, তার হাসি সুগন্ধ ছড়ায়। পথ চলতে চলতেই হিরাবাঈ গাড়োয়ান হিরামনের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেয় ও মিতা সম্পর্ক স্থাপন করে। তারপর কত গল্প, গান আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে শরিক হয় তারা দুজনে এক স্বপ্নময় যাত্রার। কথায় কথায় হিরামন বিগত যুগের লোককথা শোনায়, আর অবাক বিস্ময়ে সাগ্রহ চাউনি মেলে সেই কাহিনি শোনে হিরাবাঈ। হিরামন লক্ষ করে গল্প শোনায় মগ্ন হিরাবাঈর চেহারা কত পবিত্র মনে হয়। মহুয়া ঘাটোয়ারিনের বিয়োগান্তক গীত শুনতে শুনতে হিরাবাঈর কোমল মন দ্রবীভূত হয়। চোখের জল লুকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হিরামনকে বলে উঠে সে, তুমি তো ওস্তাদ মিতা। হিরামনকে সে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়ে বলে, আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, যে এক অক্ষর শিখিয়েছে সে ও গুরু, আর একটি রাগ শিখিয়েছে যে, সে ও গুরু। তারপর গুনগুন করে গেয়ে ওঠে মহুয়া ঘাটোয়ারিনের গান, হিরামন অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে ভাবে এতো প্রখর স্মৃতিশক্তি। কোম্পানির বাঈজী হিরাবাঈ তার সহজ শিক্ষার দ্বারাই একবার শুনেই আয়ত্ব করে নিতে পেরেছে এই গান।

এক সময় এই যাত্রা তার গন্তব্যে পৌঁছয়। ক্ষণিকের জন্য হলেও হিরাবাঈ যে রোমাঞ্চময় যাত্রাপথের বিমল আনন্দ উপভোগ করেছিল, মিতা হিরামনের সঙ্গে তারও পরিসমাপ্তি ঘটে। মেলার নারীকে মেলার জগতেই ফিরে আসতে হয়। হিরাবাঈ ফিরে যায় মথুরামোহন কোম্পানিতে, নিজের দেশের নাটক কোম্পানিতে। যাবার মুহূর্তে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে মহুয়া ঘাটোয়ারিনকে সওদাগর যে কিনে নিল— সত্যিই তো

এই বিপণনের যুগে প্রত্যেকেই এক একটি বিপণন সামগ্রী। তাই ইচ্ছে থাকলেও হিরাবাঈ তার মিতাকে ছেড়ে ব্যবসাদারের হাতে নিজেকে সঁপে দিতে বাধ্য হয়। কেবল হিরামনের দুনিয়াকেই নয়, নিজের হৃদয়কেও শূন্য করে চলে যায় সে।

৫.৩.৩ করমা (এক আদিম রাত্রি কী মহক)

আঞ্চলিক জীবনের কথাকার ফণীশ্বরনাথ রেণুর গল্পসাহিত্যে আঞ্চলিক জীবন-পরিবেশ থেকে উঠে আসা মানুষেরা ভিড় করেছে— কত বিচিত্র চরিত্র, কত বিচিত্র মানসিকতা, ততোধিক বিচিত্র তাদের জীবন। আদিম রাত্রির সুবাস গল্পের নায়ক করমাও তেমনই এক বিচিত্র চরিত্র চিত্র।

মা নেই, বাবা নেই, এই সংসারে আপনজন বলতে কেউ নেই তার। রেলের বাবুদের সঙ্গে থাকে, তাদের দেখা-শোনা ও পরিচর্যা করে, কিন্তু বিনিময়ে এক কানাকড়িও মাইনে নেয় না। তার করমা নাম যে কে দিয়েছে তাও সে সঠিক বলতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন বাবুর মুখে তার নাম বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়, নিতাইবাবু বলতেন কোরমা, ঘোষবাবু করিমা, সিং জি কামা আর অসগরবাবু বলতেন করম। তবে এ নিয়ে তার মনে কোনো খেদ নেই, সে অনায়াসে বলে উঠতে পারে নাম কি আসে যায় বাবু। এমনকি তার জন্মভূমি যে কোথায় তা-ও সে জানে না। তার নাম ও চেহারা দেখে অনেকে অনুমান করে তার ঘর সাওঁতাল পরগনার রাঁচি-হাজারিবাগ অঞ্চলে। আর কেউ যদি জানতে চায় তার ঘর কোথায় তবে সে সন্ন্যাসীর মতোই উদাসীন হয়ে বলে উঠে, যেখানে ধড়, সেখানেই ঘর। মা-বাপ, ভগবান। রেল স্টেশনের বাবুদের ঘরে কাজ করেই তার জীবন কাটে। পূর্বের বাবু গোপালবাবুই তো তার নামকরণ করেছিলেন করমা। গোপালবাবুর কাছেই সে জানতে পেরেছিল তার অতীত ইতিহাস। অসম থেকে আসা এক কুলি গাড়িতে সে পড়েছিল। সেখান থেকে উদ্ধার করেছিলেন তাকে গোপালবাবু। তারপর থেকে করমার মা-বাপ, ভাই-বোন, কুল-পরিবার সবকিছুই হয়ে পড়েন গোপালবাবু। বাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকলেও সে কিন্তু চাকরি করে না। রেলের লাইনে তার জন্মকর্ম, কিন্তু রেলের পোশাক সে গায়ে দেয়নি। শুধু রেল কেন, কোনো কোম্পানিতেই করমা চাকরি করতে রাজি নয়। সে কি কাজ করে জিজ্ঞাসা করলে করমা বলে, "বাবু কে সাথ রহতে হ্যায়" (বাবুর সঙ্গে থাকি)। সে এক পয়সার নোকর নয় কারো, কেউ বলতে পারবে না যে পয়সার জন্য সে বাবুদের সঙ্গে থাকে।

এক অদ্ভুত আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন বালকের গল্প এই এক আদিম রাত্রি কী মহক। পিতৃমাতৃ পরিচয়হীন এই বালক স্বমর্যাদায় মাথা তোলে। বাবুদের সঙ্গে থাকে, অথচ তাদের চাকর সে নয়। মণিহারী ঘাট স্টেশনে মস্তানা বাবার সৎসঙ্গেও সে দিন কাটিয়েছে, বাবা বলেন, ঘাট-ঘাটের জল খেয়ে দেখেছেন তিনি, সব জল ফিকে, এক গঙ্গাজলই মিষ্টি। এই মস্তানা বাবাই বলেছিলেন, "হর জগহ কী আপনী খুশবু-বদবু হোতী হ্যায়" (সব জায়গারই নিজস্ব সুগন্ধ-দুর্গন্ধ থাকে)। আর করমা বলে, 'নহী নোকর নহী...এ্যাসে

হী সাথ মে রহতা হুঁ" (না চাকর নই.....এমনিই সঙ্গে থাকি)। তার ঘর কোথায়? এ প্রশ্নের সমাধান হয় না। জহাঁ ধড়, ওয়হাঁ ঘর—এ কথাই তার মনে হয়।

করমার কোনো কিছুর মায়া-মোহ নেই, কোথাও শিকড় গেড়ে বসাও তার ধাতে নেই, তবুও পেছনে ফেলে আসা স্টেশনগুলোর কথা মাঝে মাঝেই তার মনকে আলোড়িত করে। মনে পড়ে লাখপতিয়া স্টেশনের কথা, নামটি জমকালো হলেও একটি ছাতু ব্যাপারির দোকানও নেই সেখানে। আশে পাশে পাঁচ ক্রোশ দূর পর্যন্ত কোনো গ্রামে নেই। তবে কেমন করে ভোলা যায় স্টেশনের পূর্বদিকের দুটো পুকুরকে। স্বচ্ছ আয়নার মতো ঝলমলে জল। বৈশাখের দুপুরে গলা জলে স্নান করার সুখ, মুখে বলার নয়। আর কদমপুরা স্টেশন, সত্য সত্যই কদমপুরা—স্টেশন থেকে গ্রাম পর্যন্ত হাজার হাজার কদমের গাছ। আবার কখনো বারিসগঞ্জ, কখনো বথনাহা স্টেশনের স্মৃতি জেগে ওঠে করমার মনে। কত লোক কত জায়গার স্মৃতি....সোনবরসার আম.....কালচুকের মাছ.....ভটোতরের দই, কিন্তু সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে মনিহারীঘাট স্টেশনের কথা। এই স্টেশনের সৌন্দর্যই অন্যরকমের। একদিকে জমি, অপরদিকে জল। একদিকে রেলগাড়ি, অপরদিকে জাহাজ। এপারে খেত-গ্রাম-ময়দান, ওপারে সাহেবগঞ্জ-কজরোটিয়ার নীল পাহাড়। নীল জল, সাদা বালি।

নতুন স্টেশনে এসে আশ পাশের গ্রামাঞ্চল ঘুরে দেখার বাসনায় একদিন বেরিয়ে পড়ে করমা। পায়ে পায়ে ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে উপস্থিত হয় একটি গ্রামে। সেখানে তার পরিচয় হয় এক বৃদ্ধ, তার স্ত্রী ও কন্যা সরসতীয়ার সঙ্গে। প্রথম পরিচয়েই এক আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায় সে। মনের ভিতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি নিয়ে স্টেশনে ফিরে আসে করমা। তারপর স্টেশন ছেড়ে চলে যাবার আগের রাতে যেন কীসের গন্ধ পায় সে। বাবুর সঙ্গে ফিরে যাওয়া হয় না তার। থেকে যায় এখানেই, সন্ধান করে নিজের ঘর-দুয়ার।

এভাবেই 'আদিম রাত্রির সুবাস' গল্পের নায়ক করমা অর্ধেক জীবন সভ্য মানুষের সঙ্গে ও স্টেশনে স্টেশনে কাটিয়ে দেওয়ার পরও শেষপর্যন্ত এক গ্রাম্য-বালিকার স্বেদ-গন্ধের আকর্ষণে গ্রামেই থেকে যায়। হঠাৎ সরস্বতীর দেহ থেকে ভেসে আসা ঘামের গন্ধ করমার মনে, হৃদয়ে প্রবেশ করে, আর করমা যেন নিজেকে, নিজের ঘরকে খুঁজে পেয়ে যায় আর সভ্য-সমাজের সহবাস ছেড়ে গ্রামেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

৫.৩.৪ মনমোহন (ইতিহাস, মজহব ঔর আদমী)

এক আদর্শবাদী, পরোপকারী জমিদার-সন্তান মনমোহনের আদর্শবাদিতার গল্পই হল ইতিহাস, ধর্ম এবং মানুষ। মনমোহন জমিদার-সন্তান হলেও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি রয়েছে তার প্রবল বিদ্বেষ। রোগপীড়িত ক্ষুধাকাতর গ্রামবাসীককে বঞ্চিত করে তার মায়ের ধুমধাম সহকারে দীপাবলি উদযাপনের প্রস্তুতিকে সে মেনে নিতে পারে না। এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটে তার। মনমোহনের মনে হয়, কতখানি হৃদয়হীন ও স্বার্থপর হলে মানুষ মহামারী কবলিত অঞ্চলে উৎসব পালন করতে পারে। অবিচার তো

শুধু এখানেই নয়, জোর করে, নানা ফিকিরে দরিদ্র মানুষের মাটি-বাড়ি আত্মসাৎ করার কাজেও তার মা শোষণের মাত্রা বাড়িয়েই চলেন। মায়ের এই অন্যায় কর্মের প্রতিবাদ করে যে তিরস্কৃত হলেও নিজের আদর্শ থেকে এক-পা ও সরে আসে না। কিন্তু বৈষম্য যে কেবল পুঁজিপতি সমাজব্যবস্থায় রয়েছে তা নয়, ধর্মপালনের জন্য মানবিকতার বিসর্জনেও প্রকাশ পায় বৈষম্য। আর ইতিহাসের ছাত্র উচ্চশিক্ষিত মনমোহন দেখতে পায়, ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে কত বৈষম্য। সত্যের অপলাপ করে, ইতিহাসকে বিকৃত করে যেভাবে একটি দেশ ও জাতির ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে, তাতে তথাকথিত ঐতিহাসিকেরা মনমোহনের চোখে তার মায়ের মতোই অপরাধী হয়ে উঠেছেন।

তবে মনমোহন একেবারে অন্য ধাতুতে গড়া। সে যেমন অন্যায়ের সমর্থন করে না, তেমনি আভিজাত্যের মিথ্যা অহমিকাকে চূর্ণ করে দরিদ্র-মানবের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতেও পিছিয়ে যায় না। দীপাবলির রাতে আলোয় আলোয় সেজে উঠা অট্টালিকা ত্যাগ করে মনমোহন অন্ধকারে পা বাড়ায়। হাঁটতে হাঁটতে মনমোহন হামিদ মিঞার ঘরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। হামিদ চাচার দরজায় দাঁড়িয়ে সে রুকিয়াকে ডাক দিল। ঝুপড়ির ভিতর থেকে কাঁপা কাঁপা একটি আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। ভিতরে ঢুকে মনমোহন দেখতে পেল রুকিয়া, শতচ্ছিন্ন কাপড় গায়ে জড়িয়ে মাটিতে পড়ে কাঁপছে আর ঝুপড়ির অপর প্রান্তে পড়ে আছে হামিদের শক্ত হয়ে যাওয়া লাশ ও পাশে পড়ে আছে মুখ মেলে থাকা বুড়ির মৃতদেহ। মনমোহন চারদিকে তাকিয়ে দেখল ঝুপড়ির ভিতর আবর্জনা ছড়িয়ে আছে, কাপড় বলতে আছে দু-চারটে শতচ্ছিন্ন কাপড়ের টুকরো। চিন্তা করতে লাগল এবার কি করবে সে, তখনই শুনতে পেল রুকিয়া বলছে তাকে জড়িয়ে ধরার জন্য নাহলে তার কাঁপুনিতে তার দেহের হাড় খুলে আসবে। মনমোহন সমস্ত দ্বিধা, সংকোচ ত্যাগ করে রুকিয়ার পিঠের উপর নিজের দেহ চেপে ধরল, নোংরা কাপড়ের গন্ধে তার মাথা ঘুরছিল.....কিন্তু একটি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ তাকে সেই ঘৃণ্য পরিবেশ থেকে দূরে সরিয়ে আনতে পারল না।

এভাবেই গল্পটির নায়ক মনমোহন জমিদার সন্তান হয়েও জমিদার-তন্ত্রের জটিল আবর্ত থেকে বেরিয়ে এসে রুকিয়ার মতো হতদরিদ্র একটি মেয়েকে বাঁচানোর জন্য জাত্যাভিমানের অচলায়তনকে ভেঙ্গে দেবার সাহস দেখিয়েছে, এবং সে তার আদর্শবাদিতা, সহানুভূতিশীলতা ও সহৃদয়তা নিয়ে হয়ে উঠেছে যথার্থ মানবতাবাদের প্রতিভূ।

৫.৩.৫ ফুলপত্তি (ভিত্তিচিত্র কী ময়ূরী)

'ভিত্তিচিত্রের ময়ূরী' গল্পটির এক অসাধারণ চরিত্র হল ফুলপত্তি। অষ্টাদশ বর্ষীয়া এই গ্রাম্য বালিকাটি তার তেজস্বিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও শিল্পকলার প্রতি থাকা নিঃস্বার্থ ভালোবাসার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ফুলপতিয়ার তেজস্বিতার পরিচয়

তখনই পাওয়া যায়, যখন ভিত্তিচিত্র অঙ্কনে মগ্ন ফুলপতিয়ার মায়ের ছবি তুলতে আসা এক শহুরে যুবককে হাকিম ভেবে সকলেই আশঙ্কিত হয়ে উঠে খাজনা আদায়ের জন্য ফুলপত্তির মা-কে অ্যারেস্ট করতেই নিশ্চয় এসেছে এই যুবক। ফুলপত্তির কানে এই খবর যেতেই সে কাজ ফেলে দৌড়ে আসে এবং যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে বলে, অ্যারেস্ট করতে হয়, জেলে যেতে হয় সে যাবে এই বুড়ো বয়সে তার মার হাতে সে হাতকড়া পরাতে দেবে না। ততক্ষণে গ্রামের পুরুষেরা কাজ ছেড়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। আঠারো বছরের ফুলপত্তি তার মাকে আগলে বসে তখনও চিৎকার করে চলেছিল প্রাণ চলে গেলেও সে তার মাকে নিয়ে যেতে দেবে না। তখন সেই যুবকটি যাকে হাকিম ভেবে এতো কাণ্ড হচ্ছিল, সে হাত জোড় করে ফুলপত্তির সামনে গিয়ে বলল সে কোনো হাকিম নয় এবং কাউকে গ্রেপ্তার করতেও আসেনি, সে এসেছে কুটির শিল্প পাটনার তরফ থেকে।

ফুলপত্তির মা পান্না দেবী গুণী মহিলা, লোকশিল্পী। ঘরের ভিতে রঙে, রেখায় ছবি ফুটিয়ে তোলায় অত্যন্ত দক্ষ। ফুলপত্তিও উত্তরাধিকার সূত্রে মায়ের এই গুণটি পেয়েছে। কিন্তু এই গুণের সহায় নিয়ে অর্থ উপার্জন অথবা খ্যাতিলাভের বাসনা তার একেবারেই নেই। তাই কুটির শিল্প পাটনার তরফ থেকে আসা সনাতনের উদ্যোগ ও তৎপরতায় পান্না দেবী যখন খ্যাতি এবং অর্থ লাভে সমর্থ হয়েছেন। সনাতন তাকে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে বসবাস করতে রাজি করে ফেলেছে, তখনই বাধ সাধল ফুলপত্তি, সে গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে একেবারেই রাজি হল না উপরন্তু এই প্রস্তাবের কথা তার কানে যাওয়ামাত্রই সে স্নান-খাওয়া ছেড়ে ঘরে পড়ে রইল। সবাই বোঝাবার চেষ্টা করে করে হার মানল।

একবার শেষ চেষ্টা করে দেখার জন্য সনাতন এগিয়ে এল। ফুলপত্তি তখন তার ঘরের দরজার ভিতে মায়ের আঁকা অসম্পূর্ণ ময়ূরীর চিত্রটিতে রঙ ভরছিল, সনাতন তাকে আরেকবার ভেবে দেখার কথা বলতেই সে উত্তর দিল, তার মা যদি যেতে চায় তো সে তাকে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু ফুলপত্তিকে যেন এ বিষয়ে কিছু না বলে। সনাতন তখন ফুলপত্তিকে জিজ্ঞাসা করে কার জন্য, কোন আকর্ষণে সে এই গ্রামে থাকতে চাইছে। ফুলপত্তি তখন ভিত্তির উপর চিত্রিত সুসজ্জিত পেখম মেলে নৃত্যরত ময়ূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল, ওই যে, ওইখানে যে নাচছে তারই আকর্ষণে...। অর্থাৎ সে কেবলমাত্র শিল্পকলাকে ভালোবেসেই গ্রামে থেকে যেতে চায়। অর্থ, যশ বা বিলাসী জীবনের হাতছানিকে উপেক্ষা করে যেখানে সত্য, শিব ও সুন্দরের অবস্থান, সেখানেই তার প্রকৃত বাসস্থান।

তাই ফুলপত্তির জেদের কাছে সনাতনকে হার মানতে হল। এই গ্রামেই একটি সেণ্টার খোলার সিদ্ধান্ত নিল সনাতন। এভাবেই নিতান্ত সাধারণ গ্রামের একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া মেয়ে ফুলপত্তির কলা-শিল্পের প্রতি অনুরাগ, আপন শিল্প-সংস্কৃতিকে বিপণন সামগ্রীতে পরিণত না করার সদিচ্ছা এবং খ্যাতি ও অর্থের পিছনে না ছুটে শুধুমাত্র নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়ে শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ সুযোগসন্ধানী স্বার্থপর মানুষের চিত্তকেও আমূল পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছে।

৫.৪ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

এই বিভাগে ফণীশ্বরনাথ রেণুর নির্বাচিত ছোটোগল্পের মূল বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। গল্প-গুলির কাহিনি সংক্ষেপ ও চরিত্র বিচারও স্থান পেয়েছে। গল্পগুলি হল— 'তৃতীয় শপথ', 'ইতিহাস, ধর্ম আর মানুষ', 'আদিম রাত্রির সুবাস' এবং 'ভিত্তিচিত্রের ময়ূরী'।

৫.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি (Sample Questions)

(১) ফণীশ্বরনাথ রেণুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(২) ফুলেশ্বরনাথ রেণুর গল্পে আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করুন।

(৩) ফুলেশ্বরনাথ রেণুর ভাষা-শৈলী আলোচনা করুন।

(৪) ফুলেশ্বরনাথ রেণুর 'তিসরী কসম' (তৃতীয় শপত) গল্পের বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

(৫) ফুলেশ্বরনাথ রেণুর 'ইতিহাস, ধর্ম আর মানুষ' গল্পের চরিত্র ও বিষয়বস্তু তুলে ধরুন।

(৬) ফুলেশ্বরনাথ রেণুর 'ভিত্তিচিত্রের ময়ূরী' গল্পের নামকরণের সার্থকতা ও গল্পের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করুন।

(৭) ফুলেশ্বরনাথ রেণুর 'এক আদিম রাত্রির সুবাস' গল্পের কাহিনি, চরিত্র ও বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।

(বিঃ দ্রঃ এছাড়াও নামকরণের সার্থকতা ও চরিত্র বিশ্লেষণ নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে।)

৫.৬ প্রসঙ্গ- পুস্তক (References/Suggested Readings)

(১) রেণু রচনাবলি (১ম, ৪র্থ খণ্ড)

(২) সুরেন্দ্র চৌধুরী : ফণিশ্বরনাথ রেণু

(৩) ড° রাগিণী বর্মা : ফণিশ্বরনাথ 'রেণু' ঔর ওনকা কথাসাহিত্য

(৪) ড° ভাগবতীশরণ মিশ্র : হিন্দি কে চর্চিত উপন্যাসকার

(৫) ড° লক্ষ্মীসাগর বাশনই : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর হিন্দি সাহিত্য কা ইতিহাস

(৬) ড° বিপ্লব চক্রবর্তী : আধুনিক হিন্দি সাহিত্য : গতি ও প্রকৃতি

(৭) ড° দেবরাজ উপাধ্যায় : আধুনিক হিন্দি : কথাসাহিত্য ও মনোবিজ্ঞান

* * *